ডিসেম্বর 1986

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

কিশোর রচনাবলী

জগদীশচন্দ্র বসু ॥ কিশোর রচনা সমগ্র ২৫.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
কিশোর রচনা সমগ্র ৩০.

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥
শার্লক হোমস্ কিশোর সমগ্র ২৫.

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ রোমাঞ্চকর ২৫

মেঘনাদ সাহা ॥ কিশোর রচনা সঙ্কলন ১২.

ভ্রমণ ও অভিযান

সুনির্মল বসু ॥ রোমাঞ্চের দেশে ৬.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
সুন্দরবনে সাত বৎসর ১০.

ধীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী ॥ দুরন্ত যাত্রী ৮.

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ গঙ্গা যমুনা ৮.

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥
আমাজনের অরণ্যে ৮.

সুনির্মল রায় ॥ চাঁদের পাড়ি ৮.

দেবব্রত চক্রবর্তী ॥ চক্রতীর্থের চমক ১০

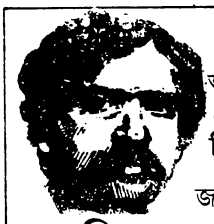

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গল্প
প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও
চিঠিপত্রের মূল্যবান সঙ্কলন

জগদীশচন্দ্র বসু

কিশোর রচনা সমগ্র ২৫.

কিশোর ক্লাসিকস্

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ **তেপান্তর** ২০.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **কিশোর অপু** ২৫.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপন পাঠশালা ১০.

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়॥ **ছোটদের কাজল** ১০.

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদা বিচিত্রা** ২৫.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার অভিযান ২৫.

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ **বাঙলার ডাকাত** ২৮.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপুর ছেলেবেলা ১০.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের অপরাজিত ১০.

রহস্য রোমাঞ্চ ভৌতিক গল্প

হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ **ভৌতিক গল্প ১০.**

আনন্দ বাগচি ॥ **মুখোশের মুখ** ৮.

কোনান ডয়েল ॥ **কিশোর রহস্য গল্প** ১০.

কোনান ডয়েল ॥ **কিশোর রোমাঞ্চ গল্প** ১০.

কোনান ডয়েল ॥ **কিশোর গোয়েন্দা গল্প** ১০.

হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ **মোহনপুরের শ্মশান** ৬.

দেবব্রত চক্রবর্তী ॥**শেরিংহত্যা রহস্য** ১০.

হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ **যক্ষপতির রত্নপুরী** ৬.

দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ **যখের আসন** ১০.

সম্প্রতি প্রকাশিত

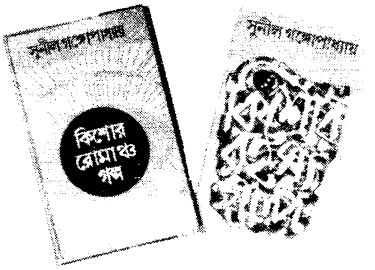

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

কিশোর রহস্য গল্প

কিশোর রোমাঞ্চ গল্প

প্রতিটি দশ টাকা

পশুপাখি বনজঙ্গলের গল্প

অমিতাভ চক্রবর্তী **ছোটদের বাঘের গল্প** ৮.

কেনেথ আন্ডারসন
শিবানীপল্লীর কালো চিতা ২০.

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ **বনে জঙ্গলে** ১৫.

অজয় হোম ॥ **বিচিত্র জীবজন্তু** ১২.

কেনেথ অআন্ডারসন
মানুষখেকোর বিভীষিকা ১৫.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ **বাঙলার গাছপালা** ১৫.

প্রেমেন্দ্র মিত্র॥ **মেজো কর্তার ভৌতিক গল্প** ১৫.

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ **শেকসপীয়ারের গল্প** ১০.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়॥ **ছোটদের মজার গল্প** ১০.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়॥ **সবার প্রিয় টেনিদা** ১০.

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ অষ্টম সংখ্যা ডিসেম্বর 1986

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সূচীপত্র

চিঠিপত্র 4 ঃ **দপ্তর থেকে** ঃ উষ্ণ প্রস্রবণের জল ॥ সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ঃ স্যার ডেরেকের নোটবুক ॥ নীলগ্রীব সিংহ 47 ॥ প্রফেসর ব্রহ্ম ও ক্লোরোফিল চোর ॥ সুধীন্দ্র সরকার 35

বিশেষ রচনা ঃ সময়ের উৎস সন্ধানে ॥ শঙ্কর সেনগুপ্ত 19

পড়াশোনা ঃ পদার্থবিজ্ঞানের কথা ॥ অজয় চক্রবর্তী 15 ঃ অ্যাসিড ক্ষারক ও লবণ ॥ বিবেক রায় 17 ঃ প্রাণিকলা ও তরুণাস্থি ॥ দিনোজ কুমার দে 51

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা ঃ মজার ইলেকট্রনিকস প্রজেক্ট ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 18 ঃ বিজ্ঞানের খবর ॥ অমিত চক্রবর্তী 27 ঃ প্রথম হাওড়ার পুল ॥ দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় 30 ঃ অ্যানেস্থেশিয়ার ইতিহাস ॥ সোমনাথ মজুমদার 39 ঃ পৃথিবীর আকার ও জ্যামিতির ধারণা ॥ অরুণ চট্টোপাধ্যায় 40 ঃ লাল সিগন্যালে সবুজ ক্রসিং ॥ সাধনকুমার গিরি 41 ঃ বিজ্ঞান সংবাদ 29 ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই 16 ঃ ডিটারজেণ্ট ॥ মিলন গঙ্গোপাধ্যায় 53 ঃ মর্কট পুরাণ ॥ কপিঞ্জল শর্মা 52 র‍্যাডার ॥ সুবীর বিশ্বাস 50 ঃ সর্বভারতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী 6

রঙিন ফিচার ঃ জানা অজানার খবর ॥ রেবতীভূষণ 11 ঃ দক্ষিণ-সমুদ্র পথে ॥ কিন্নর রায় 12 ঃ সিনিয়র কুইজ ও ফটো কুইজ 14 ঃ পত্র মঞ্জরী ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 55 ঃ পিয়ানো আবিষ্কারের গল্প ॥ অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ 56 ঃ চেনা অচেনা জীবজন্তু ও ভূগর্ভের সম্পদ ॥ অমরনাথ রায় 57 ঃ জুনিয়র কুইজ ও ফটো কুইজ 58।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ আবিষ্কার ও আবিষ্কারক ॥ রাজা মুখোপাধ্যায় 54

জীবজন্তু ও গাছপালা ঃ পক্ষিজগতের হাতিয়ার ॥ অজয় হোম 9 ঃ বীরগাসদানব কাঁকড়া ॥ চন্দন কুমার নাগ 28

ধারাবাহিক উপন্যাস ঃ নরবানরের গ্রহে ॥ অদ্রীশ বর্ধন 31

ছবিতে গল্প ঃ খুদে বিজ্ঞানী ॥ দিলীপ দাস 23 ঃ দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস ॥ গৌতম কর্মকার 43

ছোটদের দপ্তর ঃ সফল উত্তরদাতাদের নাম 59 ঃ অগ্নিসঙ্কেত ॥ বিশ্বনাথ চৌধুরী 62 ঃ শব্দকুট ॥ প্রশ্নোত্তর ॥ সুধাংশু পাত্র 64 ঃ আইকিউ টেস্ট 63 ঃ

প্রচ্ছদ ঃ মানস বিশ্বাস ॥ অন্যান্য ছবি ঃ অলয় ঘোষাল

প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর। সম্পাদক ঃ রবীন বল। সহসম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত।

মুসলিম আমলের আগেও ভারতে কাগজের প্রচলন ছিল

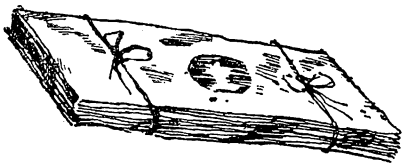

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর চিঠিতে লিখেছেন ঃ 'যেমন ধরুণ 'কাগজ'। এ শব্দটিও ফার্সি এবং এ জিনিসের কোনো প্রাচীন ভারতীয় নাম নেই। কাজেই বোঝা যায়, কাগজও মুসলিম আমলেই ভারতে এসেছিল প্রথম। (এ জিনিসের ইংরেজি নাম পেপার। তার উৎস গ্রিক প্যাপিরাস।'—পৃষ্ঠ-4

নীল নদ-এর তীরে যে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠে, তাকে বলা হয় মিশরীয় সভ্যতা বা নীলনদ-এর সভ্যতা। সেই মিশর বা ইজিপ্টে নীল নদ-এর তীরে উৎপাদিত নল-খাগড়া থেকে প্যাপাইরাস (papyrus) নামক এক প্রকার লেখার সরঞ্জাম তৈরি করা হত। প্যাপাইরাস মানুষ দ্বারা তৈরি প্রথম লেখন সামগ্রী। আনুমানিক খৃঃ পূঃ 170 থেকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে জীবজন্তুর ছাল লেখার কাজে ব্যবহার করা হত। তাছাড়া, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে লেখার জন্য বালুকা, পাথর, জীবজন্তুর হাড়, ইট, কাপড়, গাছের পাতা ও ছাল বা বাকলা আদি ব্যবহৃত হত।

উৎস ঃ (1) আধুনিক যুগত ছপা-উদ্যোগর ভূমিকা
(অসমীয়া)—রাণা প্রতাপ বড়ুয়া।
(2) The Illustrated Weekly of India June 22-28, 1986 পৃষ্ঠা 63

'কাগজ'-এর আবিষ্কার কাহিনী অনুধাবন করলে দেখা যায়, কাগজের আবিষ্কার ভারতেই প্রথম হয়। কাগজের আবিষ্কার যে ভারতে প্রথম সে বিষয়ে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি একমত।

বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় জার্ন্যাল-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ 'Outline of Paleography'-তে ডঃ এচ আর কাপাড়িয়া তথ্যসহ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে খৃষ্টপূর্ব তিন শতাব্দীর পূর্বেই ভারতে কাগজ শিল্পের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ স্যার স্টাইন (Stein) তুর্কিস্থান ও চীন এই দুই জায়গায় 'খরোষ্ঠী' লিপি দ্বারা লিখিত অতি প্রাচীন নথিপত্র উদ্ধার করেছেন। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতের মুখ্যলিপি ছিল 'ব্রাহ্মী' ও 'খরোষ্ঠী'। স্যার স্টাইন উদ্ধার করা নথিপত্র সমূহ প্রথম শতাব্দীর বলে অনুমান করা হয়েছে। এই কাগজ সমূহ তুলার কাপড়ের আঁশের মণ্ড দিয়ে তৈরি বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেহেতু 'খরোষ্ঠী' ভারতীয় লিপি ছিল, অতএব এই নথিপত্র সমূহ ভারতেই লিখিত এবং যে কাগজে লেখা তা ভারতেই তৈরি হওয়া অতি স্বাভাবিক। যেহেতু এই নথিপত্র সমূহ প্রথম শতাব্দীর বলে প্রমাণিত, অতএব ভারতেই কাগজ তৈরি করা পদ্ধতি প্রথম শতাব্দী বা তারও পূর্ব থেকেই জানা ছিল।

সম্ভবত, এই যুক্তিদ্বারা এল. পি. বারনেট (L. P. Barnett) তাঁর 'Antiquities of India' নামক অমূল্য গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন যে কাগজের প্রথম আবিষ্কার ভারতেই হয়েছে।

নতুন ফিচার

বুদ্ধি শুদ্ধি

সমীর মণ্ডলকে তোমরা অর্থাৎ কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই চেনো। আর যারা চেনো না তাদেরকে একটু সূত্র ধরিয়ে দিলে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। এবারের পুজো সংখ্যার মলাট তো সমীর মণ্ডলেরই আঁকা।

তবে যেটা বললে তোমরা হুট করে চিনে ফেলবে তা হল—কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুজো সংখ্যায় প্রথম শারদীয় উপহার 'ম্যাজিক কার্ড' এঁকেছিলেন (পরিকল্পনা ঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ) সমীর মণ্ডল। তারপর থেকে প্রায় নিয়মিতই তোমরা সমীর মণ্ডলের আঁকা চমৎকার খেলার সামগ্রী—যেমন থট্‌রীডিং কার্ড, পিকচার পাজল, অদৃশ্য খেলোয়াড় উপহাররূপে পাচ্ছ।

এই ডাকসাইটে শিল্পী শুধু আঁকাই নয় এবার থেকে লেখাও শুরু করবেন কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায়।

সঙ্গে থাকবে তাঁরই আঁকা দুর্দ্ধর্ষ সব ছবি। এবারের পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত 'হিজিবিজি ছবি নয়' থেকেই তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ কি আশ্চর্য সিরিজ তিনি তোমাদের জন্যে তৈরি করেছেন। তার কোনটি হবে ধাঁধা, কোনটি প্রকৃতির বিচিত্র বিস্ময়, কোনটি বা শুধুই মজা। সমীর মণ্ডলের আঁকা ও লেখা বুদ্ধি শুদ্ধি বেরোবে আগামী মাসে। সম্পাদক

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর একটি গ্রন্থ 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি'। এই গ্রন্থে কাপড়ের আঁশ থেকে যে কাগজ তৈরি করা যায়, তার উল্লেখ আছে। অতএব, পরোক্ষ ভাবেও আমরা ধরে নিতে পারি যে সেই সময়ে বা তার পূর্বেই ভারতে কাগজ তৈরির কৌশল জানা ছিল।

আমরা জানি, গ্রীক সম্রাট মহাবীর আলেকজেণ্ডার খৃঃ পূঃ 327-এ ভারত আক্রমণ করেন। তিনি 'ন্যারকুস্' নামে এক দূতকে পাঞ্জাবে রাখেন। ন্যারকুস-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় সেই সময় পাঞ্জাবে স্থায়ীভাবে কাপড়ের আঁশ থেকে খুব মিহি ও উজ্জ্বল এক প্রকার কাগজ তৈরি করা হয়েছিল। আবার, গ্রীক পরিব্রাজক মেগেস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় ছিলেন খৃঃ পূঃ 311 থেকে 306 পর্যন্ত। মেগেস্থিনিসের বর্ণনা থেকেও জানা যায় যে ভারতীয়রা সেই সময় জন্ম-পত্রিকা এবং পঞ্জিকা লেখার জন্য কাগজ ব্যবহার করতো। এই কাগজ ছেঁড়া কাপড়ের খণ্ড থেকে তৈরি করা হয়েছিল। এঁদের উক্তি থেকেও প্রমাণিত হয় যে ভারতীয়রা কাগজ তৈরি করার বিদ্যা জানতো।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্যও যথেষ্ট কাগজের প্রয়োজন হয়েছিল। বুদ্ধদেবের বাণী বিদেশে প্রচার করার জন্য, তাঁর বাণী-সমূহ কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বুদ্ধদেবের বাণী সম্বলিত কাগজ বিদেশে চালান করা হয়েছিল। সম্ভবত এইভাবেই ভারতীয় কাগজ তৈরির বিদ্যা পূর্বে চীন ও তুর্কিস্থান পর্যন্ত প্রচার হয়।

উৎস ঃ কাগজর আবিষ্কার চীনত নে ভারতত ?'
(অসমীয়া)—দুলেশ্বর মহন্ত।
[প্রান্তিক 16-31 মে 1984] পৃষ্ঠা—29-30

সাইলুন (Tsailun/Ts'ai Lun) নামক এক ব্যক্তি চৈনিক চীনসম্রাট 'হো'-এর (Ho-Ti) কাছে বর্ণনা দিয়েছিলেন যে খৃঃ পূঃ 105 বা তার পূর্বে চীনদেশে তুলা পাতার প্রচলন হয়। তুলাপাতা তৈরি করা পদ্ধতি চীনা যুদ্ধ-বন্দী কয়েকজনের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতিবান খলিফা হারুন্-এল্-রশীদ (Harun-al-Raschid)-এর কর্ণগোচর হয়। সেই চীনা বন্দী কয়েকজনের সহায়তায় 795 (?) খৃস্টাব্দে বাগদাদে প্রথম কাগজ তৈরি কারখানা স্থাপিত হয়। উৎস ঃ (1) আমার প্রতিনিধি—19শ বছর, 9ম সংখ্যা 1979
(2) প্রান্তিক, 16—31মে 1984 পৃষ্ঠা 29
(3) The Illustrated weekly of India : June 22—28, 1986 পৃষ্ঠা 63

ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায়, 711 খ্রীস্টাব্দে আরবীয়রা সিন্ধুপ্রদেশে রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করে। এইভাবেই 711 খ্রীস্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশে আরবদের অনুপ্রবেশ ঘটে। এবং ধীরে ধীরে ভারত তথাকথিত মুসলিমদের অধীনে আসে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট দেখা গেল, 711 খ্রীস্টাব্দের বহু বছর পূর্বেই ভারতে কাগজের প্রচলন ছিল।

অতএব, পত্রলেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মহাশয়ের 'কাগজও মুসলিম আমলেই ভারতে এসেছিল প্রথম' এই উক্তিটি মেনে নেওয়া যায় না।

এ বিষয়ে সিরাজ মহাশয়কে তাঁর উক্তির সপক্ষে 'নির্দেশ' (reference) সহ কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান-এর পাতায় আলোচনা করতে অনুরোধ করি।

সমীর কুমার সূত্রধর, সহকারী শিক্ষক, শান্তিধাম কালীবাড়ী
উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ কলোনী, বঙাইগাঁও-783380, আসাম।

ডট পেনের ব্যবহার আইনানুগ

বিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার একজন অনুরাগী পাঠক আমি। আমি বিশ্বাস করি যে এই পত্রিকা বিজ্ঞানানুরাগী প্রতিটি আবাল বৃদ্ধ বনিতার মন জয়ে সক্ষম হয়েছে।

গত মার্চ '86 সংখ্যায় অপরাজিত বসুর লেখা 'ডট্ পেন' খুব ভালো লেগেছে। তবে আমি মনে করি আরো কিছু তথ্য যুক্ত হলে লেখাটি আরো বেশি আকর্ষণীয় হত।

প্রথমতঃ বল পেন বা ডট পেনের কালির সম্বন্ধে বক্তব্য আরেকটু বেশি হওয়া উচিত ছিল। এই কালির সান্দ্রতা জলের থেকে দশ হাজার গুণ বেশি। চটচটে এই কালিতে থাকে আলো সহনীয় জৈব রঙ, গ্লাইকল, অ্যারোমেটিক অ্যালকোহল ও বিভিন্ন দ্রাবক।

দ্বিতীয়তঃ কালি যে ধীরভাবে নামে বল পেনে তার কারণটা আরেকটু ব্যাখ্যা করলে ভালো হত, ডট পেনে বলের ওপরেই থাকে তিন চারটে খাঁজ, যার ফলে ঘন কালি ধীরভাবে নামে।

তৃতীয়তঃ আর একটি বাক্য যোগ করলে লেখাটি সম্পূর্ণ হত। সেটি হল—এই পেনের ব্যবহার আইনানুগ ও সরকার স্বীকৃত।

শোভন তরফদার
বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন, অষ্টম শ্রেণী।

'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' চাই

কোনো পাঠক-পাঠিকা যদি 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' এর বিনিময়ে বাংলা দেশের কোনো পত্র-পত্রিকা পেতে ইচ্ছুক থাকেন তবে সেই পত্রিকার নাম ও আপনার ঠিকানা সহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিয়ে জানাবেন।

খায়রুল ইসলাম ফরহাদ
3, বি, কে, রায় লেন, ঢাকা-1
বাংলাদেশ।

মুসলিম আমলের আগেও ভারতে কাগজের প্রচলন ছিল

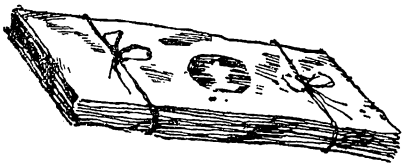

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর চিঠিতে লিখেছেন ঃ 'যেমন ধরুণ 'কাগজ'। এ শব্দটিও ফার্সি এবং এ জিনিসের কোনো প্রাচীন ভারতীয় নাম নেই। কাজেই বোঝা যায়, কাগজও মুসলিম আমলেই ভারতে এসেছিল প্রথম। (এ জিনিসের ইংরেজি নাম পেপার। তার উৎস গ্রিক প্যাপিরাস।'—পৃষ্ঠা-4

নীল নদ-এর তীরে যে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠে, তাকে বলা হয় মিশরীয় সভ্যতা বা নীলনদ-এর সভ্যতা। সেই মিশর বা ইজিপ্টে নীল নদ-এর তীরে উৎপাদিত নল-খাগড়া থেকে প্যাপাইরাস্ (papyrus) নামক এক প্রকার লেখার সরঞ্জাম তৈরি করা হত। প্যাপাইরাস্ মানুষ দ্বারা তৈরি প্রথম লেখন সামগ্রী। আনুমানিক খৃঃ পূঃ 170 থেকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে জীবজন্তুর ছাল লেখার কাজে ব্যবহার করা হত। তাছাড়া, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে লেখার জন্য বালুকা, পাথর, জীবজন্তুর হাড়, ইট, কাপড়, গাছের পাতা ও ছাল বা বাকলা আদি ব্যবহৃত হত।

উৎস ঃ (1) আধুনিক যুগত ছপা-উদ্যোগর ভূমিকা (অসমীয়া)—রাণা প্রতাপ বড়ুয়া।

(2) The Illustrated Weekly of India June 22-28, 1986 পৃষ্ঠা 63

'কাগজ'-এর আবিষ্কার কাহিনী অনুধাবন করলে দেখা যায়, কাগজের আবিষ্কার ভারতেই প্রথম হয়। কাগজের আবিষ্কার যে ভারতে প্রথম সে বিষয়ে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি একমত।

বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় জার্ন্যাল্-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ 'Outline of Paleography'-তে ডঃ এচ্ আর কাপড়িয়া তথ্যসহ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে খৃষ্টপূর্ব তিন শতাব্দীর পূর্বেই ভারতে কাগজ শিল্পের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ স্যর স্টাইন (Stein) তুর্কিস্থান ও চীন এই দুই জায়গায় 'খরোষ্ঠী' লিপি দ্বারা লিখিত অতি প্রাচীন নথিপত্র উদ্ধার করেছেন। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতের মুখ্যলিপি ছিল 'ব্রাহ্মী' ও 'খরোষ্ঠী'। স্যর স্টাইন উদ্ধার করা নথিপত্র সমূহ প্রথম শতাব্দীর বলে অনুমান করা হয়েছে। এই কাগজ সমূহ তুলার কাপড়ের আঁশের মণ্ড দিয়ে তৈরি বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেহেতু 'খরোষ্ঠী' ভারতীয় লিপি ছিল, অতএব এই নথিপত্র সমূহ ভারতেই লিখিত এবং যে কাগজে লেখা তা ভারতেই তৈরি হওয়া অতি স্বাভাবিক। যেহেতু এই নথিপত্র সমূহ প্রথম শতাব্দীর বলে প্রমাণিত, অতএব ভারতেই কাগজ তৈরি করা পদ্ধতি প্রথম শতাব্দী বা তারও পূর্ব থেকেই জানা ছিল।

সম্ভবত, এই যুক্তিদ্বারা এল্. পি. বারনেট (L. P. Barnett) তাঁর 'Antiquities of India' নামক অমূল্য গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন যে কাগজের প্রথম আবিষ্কার ভারতেই হয়েছে।

নতুন ফিচার

সমীর মণ্ডলকে তোমরা অর্থাৎ কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই চেনো। আর যারা চেনো না তাদেরকে একটু সূত্র ধরিয়ে দিলে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। এবারের পুজো সংখ্যার মলাট তো সমীর মণ্ডলেরই আঁকা।

তবে যেটা বললে তোমরা হুট করে চিনে ফেলবে তা হল—কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুজো সংখ্যায় প্রথম শারদীয় উপহার 'ম্যাজিক কার্ড' এঁকেছিলেন (পরিকল্পনা ঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ) সমীর মণ্ডল। তারপর থেকে প্রায় নিয়মিতই তোমরা সমীর মণ্ডলের আঁকা চমৎকার খেলার সামগ্রী—যেমন থট্রীডিং কার্ড, পিক্চার পাজ্‌ল, অদৃশ্য খেলোয়াড় উপহাররূপে পাচ্ছ।

এই ডাকসাইটে শিল্পী শুধু আঁকাই নয় এবার থেকে লেখাও শুরু করবেন কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায়।

সঙ্গে থাকবে তাঁরই আঁকা দুর্দর্ষ সব ছবি। এবারের পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত 'হিজিবিজি ছবি নয়' থেকেই তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ কি আশ্চর্য সিরিজ তিনি তোমাদের জন্যে তৈরি করেছেন। তার কোনটি হবে ধাঁধা, কোনটি প্রকৃতির বিচিত্র বিস্ময়, কোনটি বা শুধুই মজা। সমীর মণ্ডলের আঁকা ও লেখা বুদ্ধি শুদ্ধি বেরোবে আগামী মাসে। সম্পাদক

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর একটি গ্রন্থ 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি'। এই গ্রন্থে কাপড়ের আঁশ থেকে যে কাগজ তৈরি করা যায়, তার উল্লেখ আছে। অতএব, পরোক্ষ ভাবেও আমরা ধরে নিতে পারি যে সেই সময়ে বা তার পূর্বেই ভারতে কাগজ তৈরির কৌশল জানা ছিল।

আমরা জানি, গ্রীক সম্রাট মহাবীর আলেকজেণ্ডার খৃঃ পূঃ 327-এ ভারত আক্রমণ করেন। তিনি 'ন্যারকুস্' নামে এক দূতকে পাঞ্জাবে রাখেন। ন্যারকুস-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় সেই সময় পাঞ্জাবে স্থায়ীভাবে কাপড়ের আঁশ থেকে খুব মিহি ও উজ্জ্বল এক প্রকার কাগজ তৈরি করা হয়েছিল। আবার, গ্রীক পরিব্রাজক মেগেস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় ছিলেন খৃঃ পূঃ 311 থেকে 306 পর্যন্ত। মেগেস্থিনিসের বর্ণনা থেকেও জানা যায় যে ভারতীয়রা সেই সময় জন্ম-পত্রিকা এবং পঞ্জিকা লেখার জন্য কাগজ ব্যবহার করতো। এই কাগজ ছেঁড়া কাপড়ের পাল্প থেকে তৈরি করা হয়েছিল। এঁদের উক্তি থেকেও প্রমাণিত হয় যে ভারতীয়রা কাগজ তৈরি করার বিদ্যা জানতো।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্যও যথেষ্ট কাগজের প্রয়োজন হয়েছিল। বুদ্ধদেবের বাণী বিদেশে প্রচার করার জন্য, তাঁর বাণী-সমূহ কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বুদ্ধদেবের বাণী সম্বলিত কাগজ বিদেশে চালান করা হয়েছিল। সম্ভবত এইভাবেই ভারতীয় কাগজ তৈরির বিদ্যা পূর্বে চীন ও তুর্কিস্থান পর্যন্ত প্রচার হয়।

উৎস ঃ কাগজর আবিষ্কার চীনত নে ভারতত ?'
(অসমীয়া)—দুলেশ্বর মহন্ত।
[প্রান্তিক 16-31 মে 1984] পৃষ্ঠা—29-30

সাইলুন (Tsailun/Ts'ai Lun) নামক এক ব্যক্তি চৈনিক চীনসম্রাট 'হো'-এর (Ho-Ti) কাছে বর্ণনা দিয়েছিলেন যে খৃঃ পূঃ 105 বা তার পূর্বে চীনদেশে তুলা পাতার প্রচলন হয়। তুলাপাতা তৈরি করা পদ্ধতি চীনা যুদ্ধ-বন্দী কয়েকজনের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতিবান খলিফা হারুন্-এল্-রশীদ (Harun-al-Raschid)-এর কর্ণগোচর হয়। সেই চীনা বন্দী কয়েকজনের সহায়তায় 795 (?) খৃস্টাব্দে বাগদাদে প্রথম কাগজ তৈরি কারখানা স্থাপিত হয়। উৎস ঃ (1) আমার প্রতিনিধি—19শ বছর, 9ম সংখ্যা 1979
(2) প্রান্তিক, 16—31মে 1984 পৃষ্ঠা 29
(3) The Illustrated weekly of India : June 22—28, 1986 পৃষ্ঠা 63

ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায়, 711 খ্রীস্টাব্দে আরবীয়রা সিন্ধুপ্রদেশে রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করে। এইভাবেই 711 খ্রীস্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশে আরবদের অনুপ্রবেশ ঘটে। এবং ধীরে ধীরে ভারত তথাকথিত মুসলিমদের অধীনে আসে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট দেখা গেল, 711 খ্রীস্টাব্দের বহু বছর পূর্বেই ভারতে কাগজের প্রচলন ছিল।

অতএব, পত্রলেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মহাশয়ের 'কাগজও মুসলিম আমলেই ভারতে এসেছিল প্রথম' এই উক্তিটি মেনে নেওয়া যায় না।

এ বিষয়ে সিরাজ মহাশয়কে তাঁর উক্তির সপক্ষে 'নির্দেশ' (reference) সহ কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান-এর পাতায় আলোচনা করতে অনুরোধ করি।

সমীর কুমার সূত্রধর, সহকারী শিক্ষক, শান্তিধাম কালীবাড়ী
উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ কলোনী, বঙাইগাঁও-783380, আসাম।

ডট পেনের ব্যবহার আইনানুগ

বিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার একজন অনুরাগী পাঠক আমি। আমি বিশ্বাস করি যে এই পত্রিকা বিজ্ঞানানুরাগী প্রতিটি আবাল বৃদ্ধ বনিতার মন জয়ে সক্ষম হয়েছে।

গত মার্চ '86 সংখ্যায় অপরাজিত বসুর লেখা 'ডট্ পেন' খুব ভালো লেগেছে। তবে আমি মনে করি আরো কিছু তথ্য যুক্ত হলে লেখাটি আরো বেশি আকর্ষণীয় হত।

প্রথমতঃ বল পেন বা ডট পেনের কালির সম্বন্ধে বক্তব্য আরেকটু বেশি হওয়া উচিত ছিল। এই কালির সান্দ্রতা জলের থেকে দশ হাজার গুণ বেশি। চটচটে এই কালিতে থাকে আলো সহনীয় জৈব রঙ, গ্লাইকল, অ্যারোমেটিক অ্যালকোহল ও বিভিন্ন দ্রাবক।

দ্বিতীয়তঃ কালি যে ধীরভাবে নামে বল পেনে তার কারণটা আরেকটু ব্যাখ্যা করলে ভালো হত, ডট পেনে বলের ওপরেই থাকে তিন চারটে খাঁজ, যার ফলে ঘন কালি ধীরভাবে নামে।

তৃতীয়তঃ আর একটি বাক্য যোগ করলে লেখাটি সম্পূর্ণ হত। সেটি হল—এই পেনের ব্যবহার আইনানুগ ও সরকার স্বীকৃত।

শোভন তরফদার
বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন, অষ্টম শ্রেণী।

'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' চাই

কোনো পাঠক-পাঠিকা যদি 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' এর বিনিময়ে বাংলা দেশের কোনো পত্র-পত্রিকা পেতে ইচ্ছুক থাকেন তবে সেই পত্রিকার নাম ও আপনার ঠিকানা সহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিয়ে জানাবেন।

খায়রুল ইসলাম ফরহাদ
3, বি, কে, রায় লেন, ঢাকা-1
বাংলাদেশ।

সর্বভারতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারির অভ্যন্তরে আকর্ষণীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী হয়ে গেল গত 6—1 ই নভেম্বর 1980 পর্যন্ত। উদ্যোক্তা ছিলেন রাজ্য সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ। বিভিন্ন রাজ্যগুলি থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল নুরুল হাসান বলেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবেই আমরা উন্নত দেশগুলির থেকে পিছিয়ে আছি। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার প্রসার ঘটাতে হবে।

প্রদর্শনীতে যোগদানকারী বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিজ্ঞানের অপব্যবহার সম্পর্কে তাঁদের সতর্ক থাকতে বলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র কমল কুমার বসু ও ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে চিত্র ও মডেলের সাহায্যে বিজ্ঞানের বহু বিষয় সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়। ভারতের কুমেরু অভিযান মডেলের দ্বারা দেখান হয়। চিত্রে চিত্রে সৌর জগৎ প্রকাশ করা হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কম্পিউটারের প্রোগ্রাম দেখান হয়। নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন সংস্থার তরফ থেকে জনস্বাস্থ্য পুস্তকমালা প্রদর্শন করা হয়।

অবৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন এদেশে এরূপ প্রদর্শনী খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতামালা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণের বিষয় ছিল।

সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এই রকম একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন শুধু কি একবারই হবে?

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

নৈহাটিতে বিজ্ঞান মেলা

গত 1লা, 2রা ও 3রা জুন নৈহাটীর 'লেখার চেষ্টায়' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নৈহাটী মহেন্দ্র উচ্চ-বিদ্যালয়ে এক বিবিধ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসেবে এই তিনদিন ব্যাপী বিজ্ঞান-মেলা যথেষ্ট আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছিল।

॥ নতুন করে পাবো ॥

রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্গসংস্কৃতির প্রাণপুরুষ
কলকাতা সেই সংস্কৃতির পীঠস্থান আজও।
কবির ১২৫-তম জন্মবার্ষিকীতে আমাদের
প্রার্থনা কলকাতাকে আমরা নতুন করে পাবো,
নব নব রূপে দেখব।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

উষ্ণ প্রস্রবণের জল

সমরজিৎ কর

পশ্চিম জার্মানির বাদেন বাদেন-এ গিয়ে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছি। ছোট্ট শহর। কিন্তু ছবির মত, সবুজ গাছের বাহার। অজস্র ফুল। পর পর সাজান হাল আমলের বাড়ি। রেস্তোরাঁ। পাহাড়ে এই শহরটি পৃথিবীর ভ্রমণকারীদের কাছে একটা বড় রকমের আকর্ষণ। স্টুটগার্ট থেকে মোটরে যেতে সময় লেগেছিল ঘণ্টা তিন। ইউরোপের বিখ্যাত ব্ল্যাকফরেস্টের ভেতর দিয়ে এই পথটুকু যেতে ভারি ভাল লেগেছিল।

প্রাকৃতিক দৃশ্য তো বটেই, তবে বাদেন বাদেনের বড় আকর্ষণ এখানকার অজস্র সপা। যাদের বাংলায় বলা হয় উষ্ণ প্রস্রবণ। দেখলাম, যারা বেড়াতে এসেছে তাদের অনেকেই রোগী। কারোর বাত, কারোর চর্মরোগ, কারোর দুরারোগ্য পেটের ব্যারাম। শুনলাম, ওরা এখানকার উষ্ণপ্রস্রবণের স্নান করার জন্যে এসেছে। তাতে বাত এবং চর্মরোগ সারে। এখানে কেউ কেউ বেশ কিছুদিন থাকবে। পান করবে বিশেষ কোন প্রস্রবণের জল। তাতে নাকি পেটের ব্যারাম সারবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তো বটেই, এমন কি সুদূর আমেরিকা থেকেও এখানে আসে অজস্র রোগী। শুধু আজই নয়, রোগীদের এখানে আসা-যাওয়া চলছে শত শত বছর ধরে।

জেনে খুশি হবে, ভারতেও রয়েছে অজস্র উষ্ণ প্রস্রবণ। আসামের কাছার জেলায় গরমপানিতে যাও। দেখবে প্রচুর উষ্ণ প্রস্রবণ। গভীর ভূস্তর থেকে বেরোচ্ছে গরম জল। কোন কোন জায়গায় সে জল এত গরম যে তাতে হাত দেওয়া শক্ত। জলের ভেতর নানারকম গ্যাসের বুদ্‌বুদ্‌। বিশেষ করে গন্ধকের গ্যাস। উষ্ণ প্রস্রবণের জলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণও থাকে। পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বরে গেলেই দেখবে। চিকিৎসকরা বলেন, ওই জলে মিশে থাকা নানারকম রাসায়নিক যৌগ এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণই রোগ সারায়।

কথাটা মিথ্যে নয়। তবে কোন কোন উষ্ণ প্রস্রবণের জল যে বিপদও ঘটাতে পারে তারও নজির রয়েছে।

যেমন ধরো, টুবার উষ্ণ প্রস্রবণের কথা। টুবা গুজরাটের পঞ্চমহল জেলার একটি গ্রাম। এই গ্রামটির আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে পঁচিশটিরও বেশি উষ্ণ প্রস্রবণ। 1981 সালের গোড়ায় ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা গিয়েছিলেন এইসব প্রস্রবণের জল পরীক্ষা করতে। তাঁরা লক্ষ্য করেন, প্রস্রবণগুলির জলধারা থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে গামারশ্মি। যার মাত্রা 0 4 থেকে 2·2 মিলির‍্যাড / ঘণ্টা। তাঁদের ধারণা, এই তেজস্ক্রিয় রশ্মি মানুষের কোন ক্ষতি করে কিনা, সেটা দেখা দরকার। যদি ক্ষতিকর হয়, স্নানার্থীদের সাবধান করা উচিৎ। তাঁদের এই কথা অনেককে ভাবিয়ে তুলেছে এখন।

প্রস্রবণগুলিকে ভাগ করা হয় দুটি শ্রেণীতে। শীতল প্রস্রবণ এবং উষ্ণ প্রস্রবণ। প্রস্রবণের জলের তাপমাত্রা যখন আবহাওয়ার কাছাকাছি থাকে, তখন তাকে বলা হয় শীতল প্রস্রবণ বা 'কোল্ড স্প্রিং'। আর আবহাওয়ার তাপমাত্রা থেকে 15 ডিগ্রি ফারেনহাইট অথবা তার চেয়ে বেশি হলে বলা হয় উষ্ণ প্রস্রবণ বা 'হট স্প্রিং'। ভারতে রয়েছে প্রচুর প্রস্রবণ। যাদের অনেকেরই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক ওপরে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুজরাটের টুবা, উনুনাই এবং নাসুন্দার উষ্ণ প্রস্রবণ, হরিয়ানার সোহানা, পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বর, বিহারের অন্তলৌ এবং রাজগীরে, কুলু উপত্যকার মনিকরণ এবং মহারাষ্ট্রের বজ্রেশ্বরীর উষ্ণ প্রস্রবণ।

মাটির বুকে নামে বর্ষা। আর আছে নদীনালার প্রবাহ। তাদের জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভূস্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ক্রমে ক্রমে উষ্ণ হতে থাকে। সেই উষ্ণতা কতটা দাঁড়াবে সেটা অবশ্য নানান কারণের উপর নির্ভর করে।

যেমন ধরো, অঞ্চল বিশেষে ভূতাত্ত্বিক অবস্থা অনুযায়ী এই তাপমাত্রার বৃদ্ধি এক এক রকম হয়ে থাকে। গড়ে 75 ফুট গভীরতা বাড়লে তাপমাত্রা বাড়ে গড়ে 1 ডিগ্রি ফারেনহাইটের মত। জল যত গভীরে নামে, তাপমাত্রাও বাড়ে। সঞ্চিত হয় শিলাস্তরে। সঞ্চিত এই জল উদ্গিতি চাপের দরুন পরে ভূস্তরের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এসে সৃষ্টি করে উষ্ণ প্রস্রবণ। অথবা, কোথাও হয়ত ভূস্তরের অগভীর অঞ্চল পর্যন্ত উঠে এসেছে ভূস্তরের গভীর থেকে গলিত শিলা বা 'ম্যাগমা'। এ ধরনের ঘটনা সাধারণত যে সব অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি থাকে, সেইসব অঞ্চলেই দেখা যায়। জল যখন সেই গলিত শিলার সান্নিধ্যে আসে, তার তাপমাত্রা অনেকটা বাড়তে পারে। 70 থেকে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। আইসল্যান্ড, ক্যালি ফার্নিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ইটালির কোন কোন অঞ্চলে এ ধরনের বেশ কিছু উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে।

কোন কোন অঞ্চলে আবার ভূস্তরের ভেতর গড়ে ওঠা কূপ বা চোঙের মত গঠন। এই কূপ গভীরতর ভূস্তর পর্যন্ত নেমে গিয়ে 'ম্যাগমা' পর্যন্ত পৌঁছয়। কূপের মধ্যে জমে ওঠা জল 'ম্যাগমা'র উত্তাপে গরম হয়ে ওঠে। তাপমাত্রা দাঁড়ায় 100 থেকে 130 ডিগ্রি সেলসিয়াস-এ (অতিরিক্ত চাপে জলের স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে)। তখন সেই উষ্ণজলের নিচের দিকে সৃষ্ট হয় উচ্চ চাপ। সেই চাপে কূপের মুখ দিয়ে আকাশপানে উঠে আসে উষ্ণজলের ফোয়ারা এবং বাষ্প। জলীয় বাষ্পের চাপ কমলে ফোয়ারা বন্ধ হয়। আবার যখন কূপের গর্ভে চাপ বাড়ে দেখা দেয় ফোয়ারা। কখনো সমপ্রবাহে, কখনো ঝলকে ঝলকে। এ ধরনের প্রস্রবণকে বলা হয় 'গেজার'।

ভূস্তরে থাকে নানারকম রাসায়নিক যৌগ। চুঁইয়ে আসা অথবা সঞ্চিত জল কোন কোন রাসায়নিক যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া করার সময় তাপ সৃষ্টি হয়। সেই তাপেও ভূগর্ভস্থ জল উষ্ণ হতে পারে। কোথাও কোথাও ভূ-অভ্যন্তরে পারস্পরিক শিলাস্তরে ঘটে ঘর্ষণ। সেই ঘর্ষণেও তাপ সৃষ্টি হয়। ভূস্তরের গভীরে কোথাও বা চলে পারমাণবিক বিক্রিয়া। সেই বিক্রিয়ার দরুনও তাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেই তাপেও উষ্ণ হতে পারে জল।

যাই হোক না কেন, কতকগুলি কারণে উষ্ণ প্রস্রবণ মানুষের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। উষ্ণ প্রস্রবণের জলে (শীতল প্রস্রবণেরও) থাকে নানান রাসায়নিক যৌগ—ক্যালসাইট্স, হাইড্রোজেন সালফাইড, ডোলোমাইট, জিপসাম, কার্বনিক অ্যাসিড প্রভৃতি। থাকে আরো নানান খনিজ পদার্থ। হয়ত এই কারণেই প্রস্রবণের জল রোগ নিরাময়ে কাজ করে। যে সব উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে উচ্চচাপে জলীয় বাষ্প বেরোয়, তাদের সেই বাষ্পের চাপের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে এবং সেই টারবাইনের সঙ্গে জেনারেটার লাগিয়ে কোন কোন জায়গায় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনেও হাত দেওয়া হয়েছে। এ সব দেশের মধ্যে রয়েছে ইটালি, আইসল্যান্ড, সোভিয়েত দেশ, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র। ভারতে জম্মু এলাকায় রয়েছে পুগা উপত্যকা। এই উপত্যকার উষ্ণ প্রস্রবণের বাষ্পের সাহায্যে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালানর পরিকল্পনা নিয়েছে ভারত সরকার। যার ক্ষমতা হবে পাঁচ মেগাওয়াট।

যারা উষ্ণ প্রস্রবণের জলে স্নান করেন, তাদের কিন্তু ভয় পাইয়ে দিয়েছেন ভাবা পারমাণবিক গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, টুবার উষ্ণ প্রস্রবণের জলে রয়েছে রেডিয়াম-226 এবং রেডন-222। এরা তেজস্ক্রিয় বস্তু। এদের থেকে বিকীর্ণ হয় গামা রশ্মি। এই রশ্মি বেশি দেখা গিয়েছে এখানকার রামকুণ্ড নামে একটি প্রস্রবণে। টুবার পনের কিলোমিটার দূরে গোধরা গ্রাম। এখানকার জলেও ধরা পড়েছে গামা রশ্মি। এমন অবস্থায় তাদের জলে স্নান করলে বিপদ। তাদের জল পান করাও বিপদ। এতে করে ক্যানসার হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তাই ওই সব প্রস্রবণের জল নিয়মিত ব্যবহার না করার জন্যে উপদেশ দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বলতে পারো, প্রাকৃতিক কারণেও যে পরিবেশ দূষিত হয়, ওই উষ্ণ প্রস্রবণগুলিই তার বড় রকমের প্রমাণ।

সমরজিৎ করের

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥ ২০ টাকা

পরিশিষ্টে ১৯০১—১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রাপকগণের তালিকা সংযোজিত।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9

পাখির হাতিয়ার

অজয় হোম

পৃথিবীতে ঠিক চার প্রজাতির পাখিকে হাতিয়ার (tools) ব্যবহার করতে দেখি। পয়লা নম্বর হচ্ছে গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপের ছোটো চঞ্চু কাঠঠোকরা ফিঞ্চ। ফিঞ্চ হচ্ছে মুনিয়া-চড়ুই জাতের পাখি। এরা ফণীমনসা জাতীয় (Cactus) গাছের কাঁটা ভেঙে নিয়ে তা কোনো গাছের ছালের ফাঁকে লুকিয়ে থাকা পোকাকে খুঁচিয়ে বের করে খায়। খোঁচা খেয়ে ফাঁক থেকে পোকা বেরিয়ে এলেই কাঁটাটাকে পাশে রেখে দিয়ে তাকে ধরে। সেটাকে শেষ করে আবার কাঁটা খোঁচায়। এইভাবে তারা হাতিয়ার ব্যবহার করে। এই ক্ষমতা নিশ্চয়ই জন্মগত কিন্তু ক্যাকটাসের কাঁটা ঠিকভাবে ব্যবহার করাটাও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ।

আমাদের শ্বেত শকুন বা গিন্নি শকুনের (White Scavanger Vulture) এক জ্ঞাতি মিশরীয় শকুন উটপাখির ডিম ভাঙার জন্যে বেশ বড়ো পাথর ব্যবহার করে। এই শকুনরা বড়ো পাথর একটা বেছে নিয়ে চঞ্চুতে তুলে হেঁটে ডিমের কাছে যায়। আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পাথরটাকে ডিমের উপর ফেলে ভাঙে। অপরিণত অর্থাৎ যারা পূর্ণবয়স্ক নয় তারাও ভাঙতে চেষ্টা করে কিন্তু তাদেরটা ডিমের বাইরে পড়ে এবং সুখাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়। এটাই প্রমাণ করে যে এই আচরণ জন্মগত কিন্তু ঠিকমতো ব্যবহার করার জন্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার প্রয়োজন।

তিন জাতের কুঞ্জ (Bower) পাখি আগাছার রসের রঙ ব্যবহারে তাদের কুঞ্জকে রূপদান করে। এদের মধ্যে দুটি জাতি রঙ করার জন্যে ব্রাশ ব্যবহার করে। ব্রাশের জন্যে আঁশালো ছাল ব্যবহার করে 'স্যাটিন বাওয়ার বার্ড'। 'রিজেন্ট বাওয়ার বার্ডে'র পুরুষ কাঁচা পাতার গুচ্ছ দিয়ে রঙ করে। অবশ্য কিছু পাখি আছে যারা কোনোরকম হাতিয়ার ব্যবহার করে না বটে কিন্তু তাদেরও এই প্রসঙ্গে নাম করা উচিত, যেমন 'ইওরোপীয় গাইয়ে থ্রাস'। থ্রাস আমাদের বাংলাদেশের দামা (Orangeheaded Ground Thrush) জাতীয় পাখি। এই ইওরোপীয় গাইয়ে থ্রাসেরা শামুক-গুগলির শক্ত খোলা ভেঙে নরম অংশটাকে খাওয়ার জন্যে বিশেষ ধরনের এক পাথরকে নেহাইরূপে ব্যবহার করে। গাংচিলরা (Gulls) শক্ত খোলার কাঁকড়া বা কম্বোজদের ভাঙে উপর থেকে মাটিতে ফেলে। দেড়েল শকুনদের (Lammergeyer Vultures) বিশেষ জায়গা থাকে যেখানে, শূন্য থেকে মোটা হাড় পাথুরে জমিতে ফেলে ভেঙে তার ভিতরের নলি (marrow) খায়। কচ্ছপকেও এইভাবে ফেলে ভাঙে। চোরপাখি (Nuthatches) ও বড়ো ছিটেল কাঠঠোকরারা (Great Spotted Woodpeckers) পাথরের ফাঁকে মোটা খোলার বাদাম ভাইসের (Vice) মত আটকে রেখে তাদের শক্তিমান শক্ত চঞ্চু দিয়ে ভাঙে।

খাদ্য সঞ্চয়

ঋতুতে ঋতুতে নানাধরনের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও কয়েক প্রজাতির পাখি খাদ্য সঞ্চয় করে। কসাই পাখি জাতীয় লাটোরা পাখিরা অর্থাৎ লটুষক বংশীয়রা (Laniidae) সাধারণত পরিযায়ী পাখি কিন্তু তারাও যে সঞ্চয় করে তা কিন্তু বেশিদিনের জন্যে নয়। তবু করে। তারা টিকটিকি-গিরগিটি ফড়িং, খুব ছোটো ছানা পাখি বাবলা জাতীয় গাছের কাঁটায় বিঁধিয়ে রাখে। শীতকালে খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতির কারণে আগাম যেসব পাখি খাদ্য লুকিয়ে রাখে, তাদের মধ্যে বহু ইওরোপীয় বামগাংরা জাতের (Tits) পাখিরা হয় গাছের ফোকরে না হয় লাইকেন (Lichen) ও শেওলার মধ্যে সঞ্চয় করে, চোরপাখিরাও তাই করে। উত্তর আমেরিকার অ্যাকর্ণ (ওকফল) কাঠঠোকরারা একটা গাছের মধ্যে চঞ্চু দিয়ে গর্ত করে একটি করে ওকফল লুকিয়ে রাখে। একটা গাছে দেখা গেছে 50,000 এইরকম গর্ত। এক-একটি ওকগাছকে বংশ পরম্পরায় এই কাঠঠোকরারা বেছে নেয়। প্রতিটি গাছই একটি ছোটো দলের বংশগত সম্পত্তি। এইরকম পকফল সঞ্চয় প্রবৃত্তি দেখা যায় নীলকণ্ঠ জাতীয়

কুঞ্জ পাখি—মুখে কাঁচা পাকার গুচ্ছ

জে (Jay) পাখির মধ্যে। বাদামভাঙা (Nutcrackers) ও জে-পাখিরা শীতকালে আশ্চর্যজনকভাবে জায়গার কোনো ভুলচুক না করে পাঁচ-ছ ইঞ্চি বরফের তলা থেকে সঞ্চিত খাদ্য তুলে নিতে পারে। এটা তারা করতে পারে গাছ ও কোনো বাড়ির অবস্থান থেকে, কারণ এইসব চিহ্নিত স্থান সবটাই বরফে ঢেকে যায় না। আমাদের দেশেও দক্ষিণ ভারতে গেরমোপা বা জোগ জলপ্রপাতের গায়ে পর্বতের খাঁজে ও গুহায় গোলা পায়রারা (Blue Rock Pigeon) মাঠ থেকে ধান এনে সঞ্চয় করে বর্ষাকালে খাবে বলে। কথিত আছে, গেরসোপ্পায় ধানসংগ্রহ এত বেশি হতো যে সেখান থেকে ধান এনে বোম্বাই সরকার তা নিলাম ডেকে পাঁচশ টাকায় বিক্রি করতেন। এ প্রায় একশ বছর আগের ঘটনা। এই বিক্রির নথিপত্তর নষ্ট হওয়াতে সব প্রমাণ লোপ পেয়েছে। যেসব ব্যক্তিরা পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝুড়িতে বসে দড়ি ঝুলিয়ে নেমে এসে গোলা পায়রার সংগৃহীত ধান সংগ্রহ করত, তাদের মধ্যে একজনের দড়ি ছিঁড়ে পড়ে মৃত্যু হওয়ার জন্যে বাৎসরিক 70-80 কুইন্টাল ধানসংগ্রহ বন্ধ হয়ে যায়। দুঃসাহসের পরিচয় আর কেউ দেয় নি। এইরকম সঞ্চয়ের খবর আরও দু'চারটে যে নেই তা নয়, তবে তার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

পাখির গান

পাখির গান নিয়ে আমরা কবিতা ও লেখার মধ্যে যতই ঢোকাই না কেন এবং তা শোনার জন্যে পুষে নানা কৃত্রিম উপায় গ্রহণ করি না কেন, আসলে এই সংগীতের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পাখির গান জটিল যোগাযোগকারী পন্থা, যা শোনা যায় তাদের প্রজনন কালেই। যদিও শুনতে সুখশ্রাব্য কিন্তু আসলে সেই সংগীত দুদিক ধারওয়ালা অস্ত্রবিশেষ। তাদের এই স্বরবিন্যাস নির্ভর করছে কে শুনছে তার উপর। পুরুষ পাখিই গান গায়। সুরেই বোঝা যায় গায়ক কোন্ লিঙ্গ এবং সে জানাচ্ছে তার একটা ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য আছে, অন্য পুরুষ দূরে থাকো এবং তার সঙ্গী তখনও হয়তো জোটে নি। স্ত্রী-পাখি তা শুনে আকৃষ্ট হতে পারে এবং খুবই উত্তেজনা অনুভব করে।

প্রত্যেক প্রজাতির গানের নিজস্ব ধারা আছে যার দ্বারা সঙ্গীকে আকর্ষণ করে এবং সুর নিকটতম প্রজাতি থেকে ভিন্ন। স্ত্রী-পাখিকেই শেষ পর্যন্ত পছন্দ করতে হয় তার নিজস্ব প্রজাতির বিশেষ সংগীতের মালিককে। অনেক সময় এই গান সাবধান করে দেয় যাতে সে তার দয়িত-পছন্দ ভুল না করে বসে। জাতের বাইরে যেতে চায় না।

অনেক পাখির আবার দ্বৈত-সংগীত আছে। পুরুষ একটা সুর ছাড়ল, স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। অনেক সময় ভুল হয় একটি পাখিই বুঝি ডাকছে।

পাখিদের দু'রকম ডাক শোনা যায়। এক অন্য পাখিকে ডাকা ও বিপদজ্ঞাপক সংকেত, অপরটি সত্যিকারের সংগীত। প্রথম ডাকে বলে, 'আমি এখানে' কোথায় তুমি ? এতে নিজের দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাই প্রধান কাজ হয়। এছাড়া উড়ে এক জায়গা থেকে যাবার আগে 'ওড়ার ডাক' দেয়।

ফিঞ্চ—খোঁচা দিচ্ছে ঠোঁটে কাঠি

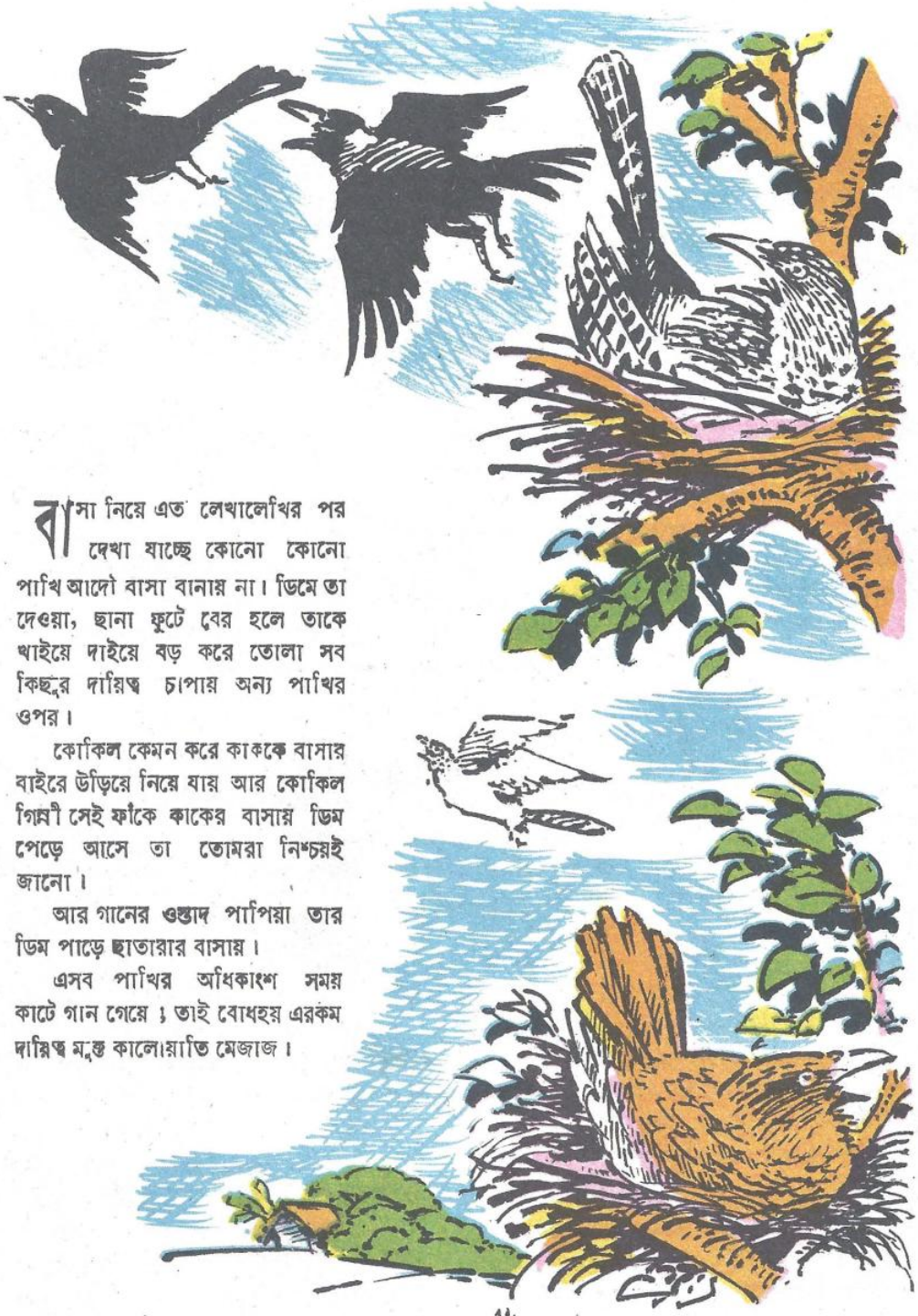

বাসা নিয়ে এত লেখালেখির পর দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো পাখি আদৌ বাসা বানায় না। ডিমে তা দেওয়া, ছানা ফুটে বের হলে তাকে খাইয়ে দাইয়ে বড় করে তোলা সব কিছুর দায়িত্ব চাপায় অন্য পাখির ওপর।

কোকিল কেমন করে কাককে বাসার বাইরে উড়িয়ে নিয়ে যায় আর কোকিল গিন্নী সেই ফাঁকে কাকের বাসায় ডিম পেড়ে আসে তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো।

আর গানের ওস্তাদ পাপিয়া তার ডিম পাড়ে ছাতারার বাসায়।

এসব পাখির অধিকাংশ সময় কাটে গান গেয়ে ; তাই বোধহয় এরকম দায়িত্ব মুক্ত কালোয়াতি মেজাজ।

অভিযানের গল্প 5

দক্ষিণ সমুদ্রের পথে

কিন্নর রায়

শুয়োর পোষা শুরু করেছিলেন ভাস্কো নুনেজ ডি বালবোয়া অনেক টাকার স্বপ্ন নিয়ে। দারুণ বড়লোক হওয়ার ইচ্ছে। শেষ অব্দি ব্যবসায় মারাত্মক লোকসান করে প্রায় পথে বসার দাখিল। বালবোয়া দাবি করতেন তাঁর জন্ম স্পেনে 1475-এ। যদিও তাঁর শুয়োরের ব্যবসা আর লোকসান করতে করতে ক্রমাগত ধারে ডুবে যাওয়ার ঘটনা স্পেনের উপনিবেশ—ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে।

1510-এ মার্টিন ফার্নান্ডেজ ডি (Enciso-র) নেতৃত্বে এক অভিযানে ভিড়ে গেলেন বালবোয়া। 34 বছরের এই কাঠ গোঁয়ার, দুঃসাহসী মানুষের মাথার চুল ছিল লাল। সঙ্গে নিলেন বড়সড় ব্লাড হাউন্ড Leoncico-কে। হিসপ্যালিঅলা দ্বীপপুঞ্জকে বিদায় জানিয়ে তাঁদের অভিযান তরী রওনা দিল। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় তলোয়ার চালানোয় দক্ষ, যোদ্ধা বালবোয়া 1500 খ্রিস্টাব্দের স্প্যানিশ অ্যাডভেঞ্চারে ছিলেন।

খুব তাড়াতাড়ি তাঁরা ঢুকে পড়লেন uraba উপসাগরে। উপসাগরের ধার থেকে রেড ইন্ডিয়ানরা ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাঁদের আক্রমণ করল। এর আগেও এমন আক্রমণ হয়েছিল স্পেনীয় ঔপনিবেশিকদের ওপর। তাদের ছোট্ট বসতি জ্বালিয়ে দিয়েছিল স্থানীয় মানুষেরা। যে কজন মাত্র স্পেনীয় বেঁচে রইলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ফ্রান্সিসকো পিজারো, যিনি পরে জয় করেছিলেন পেরু। অত্যাচার, লুণ্ঠন আর রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়েছিলেন সেই দেশ।

বিপদের মধ্যে পড়েও বালবোয়া বুদ্ধি হারান নি। 1500-তে অভিযানের স্মৃতি টেনে এনে বললেন, তিনি একটি 'ইন্ডিয়ান' গ্রাম দেখেছিলেন, চারপাশে সবুজ শস্য ক্ষেত্র, এই উপসাগরের উল্টোদিকেই সেই দেশ। আর আছে একটা নদী। ওখানকার মানুষেরা জানে না বিষ মাখানো তীরের ব্যবহার। তাঁর কথায় তখন সকলেরই আপাত স্বস্তি। উপসাগরে ছোট ছোট নৌকো ভাসল সেই 'সবুজ' দেশের দিকে।

রিও টানেলা নামের সেই গ্রাম সত্যি সত্যি ছিল। সেখানে তীরের ভয় ছিল না। শিকারী কুকুর আর বন্দুক দিয়ে খুব শিগগীরই স্পেনীয়রা ঐ গ্রামের স্থানীয় মানুষজনকে কায়দা করে ফেলল। জঙ্গল আর নদীর মধ্যেকার এই সুন্দর অঞ্চলে অধিবাসীরা চাষ করে আলু, আনারস, শস্য এবং সাবু। জঙ্গলে রয়েছে বাঁদর, গেছো-ব্যাং, আর আরও সব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম না জানা রঙ-বেরঙের পাখি। গ্রামের প্রধানকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেয়া হলো কয়েক মাসের মধ্যে। স্পেনীয়রা ঠিক করল এই তৈরি হিসেবে পাওয়া শহরে তারা রাজধানী করবে। বলতে গেলে আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের ওপর ইউরোপীয়দের প্রথম রাজধানী হলো এখানেই।

Enciso পেশায় ছিলেন উকিল। নেতৃত্ব করার থেকে পড়াশুনাতেই তাঁর বেশি মনোযোগ। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই সবাই বালবোয়াকেই মেনে নিল নেতা হিসেবে। Enciso-কে জাহাজে তুলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো স্পেনে। রাজা ফার্ডিনান্ডকে বালবোয়া রিপোর্ট পাঠিয়েছিল 'এখানে ওষুধ ছাড়া আর কোনো কিছুরই দরকার নেই। আর 'শয়তান' না হয়ে কোন উকিলই যেন এদেশে না আসেন।' 1511-র মে মাসে সান্তা মারিয়ার আশি মাইল উত্তরে 100 জন নিয়ে অভিযান করলেন বালবোয়া।

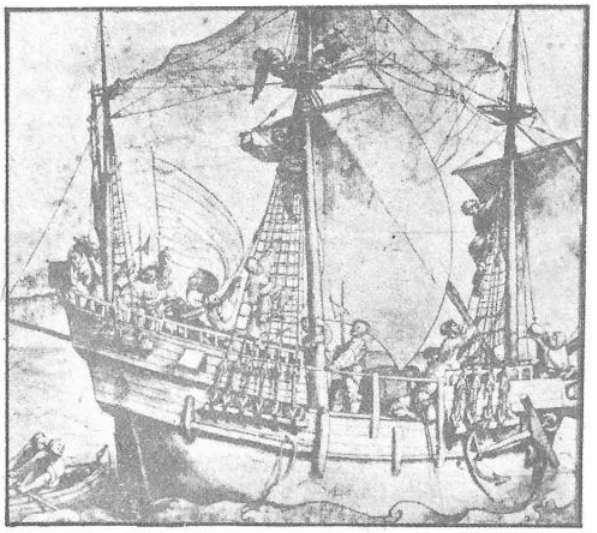

Careta-র মানুষদের ওপর প্রথমে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো গায়ের জোরে, তারপর বালবোয়া দিলেন এক কূটনৈতিক চাল। Careta-দের দলপতি চিমা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর নিজের সুন্দরী মেয়েকে উপহার হিসেবে দিলেন বালবোয়াকে। চিমা স্পেনীয়দের খাবার দাবার, সোনা দেবেন বলে কথা দিলেন। আর দেবেন শ্রমিক। এই সাহায্যের উদ্দেশ্য, পাশের Ponca উপ জাতীয়দের, যাঁদের তিনি শত্রু বলে ভাবেন, শিক্ষা দেয়া।

স্পেনীয়রা ঝাঁপিয়ে পড়ল Ponca-দের ওপর। হত্যা, লুণ্ঠন! গ্রাম জ্বালিয়ে ছারখার। ওদের সমস্ত সোনা দখল করে নিল বালবোয়ার লোকজন এই ঘটনা চিমাকে এতটা উৎসাহিত করল যে চিমা Comogra-র প্রধান Comogra-র কাছে বালবোয়াকে পাঠাতে রাজি হয়ে গেলেন। আরও উত্তরে Comogra হলো এক উর্বর শস্য-ক্ষেত্রের দেশ। Comogra-তে বালবোয়া পেলেন দারুণ আতিথেয়তা। সোনার মুকুট মাথায় সেই দেশের শাসনকর্তা তাঁর সাত ছেলেকে নিয়ে নিতে এলেন বালবোয়াকে। সোনা, সোনা—চারপাশেই সোনা। ইউরোপের মানুষেরা তো অবাক, হতভম্ব। তাদের চোখের মণিতে লোভের সাপ।

শাসনকর্তার প্রাসাদে ধোঁয়াওঠা হরিণের মাংস, আর দক্ষিণ আমেরিকার ঝলসানো শুয়োর। সঙ্গে মদ আর ভুট্টার বীয়ার। সবচাইতে অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার, এখানকার ছোট্ট খাট্ট মেয়েরা দিনে পাঁচবার চান করে, গায়ে মাখে সুগন্ধী প্রলেপ।

পূর্বপুরুষদের জহরত আর সোনায় মোড়া মৃতদেহ দেখতে সুযোগ পায় বালবোয়ার দলবল। এই 'পবিত্র' জায়গাটিতে এসেও তাদের ক্ষমাহীন লোভ। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শাসনকর্তা স্পেনীয়দের উপহার দিলেন বাছাই করা সোনার গয়না আর 70 জন শ্রমিক।

Comogra-র ছেলে Pongniaco বলল, এই সামান্য সোনা দেখেই তোমরা ঘাবড়ে যাচ্ছ, আমি তোমাদের এমন দেশের খবর দেব, যেখানে সোনা, সোনা আর সোনা···। পাহাড় পেরিয়ে দক্ষিণের যে সমুদ্র সেখানে এই জায়গা।

1511 তে সান্তামারিয়ায় ফিরে এসে বালবোয়া তৈরি হলেন অভিযানের জন্যে। চারপাশে তখন নানান সমস্যা। ফসল হয়নি। বানে, বন্যায় ফসল ধুয়ে মুছে গেছে। অভিযান শুরু করতে 1512-র মার্চ মাস এসে গেল। Gulf of uraba থেকে শুরু হলো অভিযান। 1513 খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজা ফার্ডিনাণ্ডকে এক চিঠিতে জানালেন, এই অভিযান খুবই কষ্টকর। পাহাড়, নদী, দুর্গম পথ পেরোতে গিয়ে আমাদের অনেক সঙ্গী মারা যাচ্ছেন। কোথাও কোথাও জামাকাপড় খুলে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় পেরোতে হচ্ছে জল—এমন বিবরণও তাঁর চিঠিতে ছিল।

রাজা ফার্ডিনাণ্ড তাঁকে নিযুক্ত করলেন Darrien-এর শাসনকর্তা হিসেবে। যার বিস্তৃতি ছিল Rio Tanela থেকে

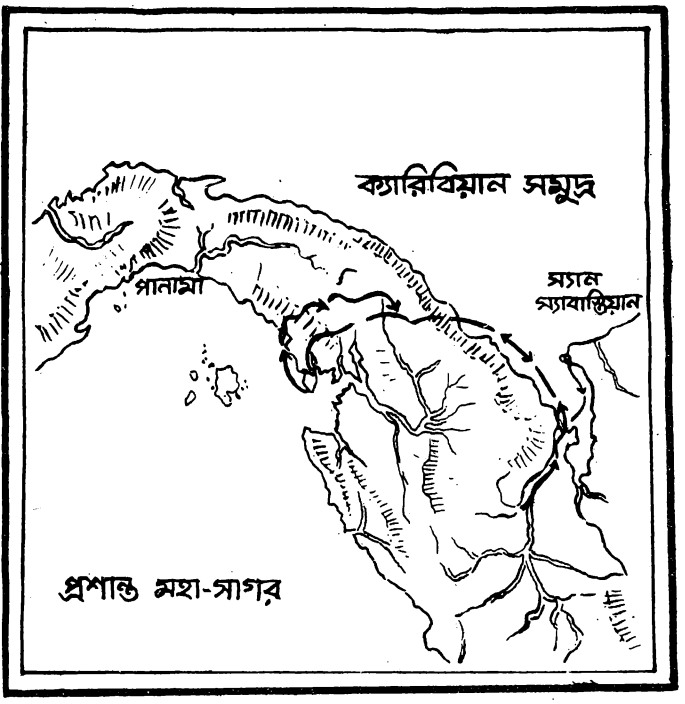

এখনকার পানামা পর্যন্ত। অন্যদিকে Gulf of uraba অব্দি। বালবোয়া জানতেন রাজাকে সোনা সরবরাহ না করতে পারলে তাঁর সঙ্গী থাকবে না। তাঁর বদলে অন্য কেউ আসবে। তাঁর মাথায় তাই খেলে গেল এক নতুন পরিকল্পনা—যে বিশাল সাগর ইউরোপের কেউ দেখে নি, তা আবিষ্কার করা। 1513-র 6 সেপ্টেম্বর পিজারো সমেত 92 জন সৈন্য, 2 জন পুরোহিত আর ইণ্ডিয়ান গাইড নিয়ে রওনা হলেন বালবোয়া। সঙ্গে একপাল শিক্ষিত ব্লাড হাউণ্ড।

অসম্ভব কষ্ট, দুর্গম পথ পেরিয়ে 1513 খ্রিস্টাব্দের 25 সেপ্টেম্বর বেলা দশটা নাগাদ দেখা গেল একটি উঁচু পাহাড়। তার মাথায় কুকুর Leoncico-কে সঙ্গে নিয়ে উঠলেন বালবোয়া। তারপর দেখতে পেলেন নীল রেখা—জল। এই সেই দক্ষিণ সমুদ্র।

এত কাণ্ড করার পরও বালবোয়া দীর্ঘদিন তাঁর জায়গায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন নি। স্পেনের রাজা সত্তর বছরের Pedrarias নতুন শাসনকর্তা করে পাঠালেন। 1514 খ্রিস্টাব্দে এলেন তিনি, সঙ্গে দুহাজার অশ্বারোহী সৈন্য। তারপরেই ক্রমাগত মতান্তর, মনান্তর, সংঘাত এবং সংঘর্ষ। 1519 খ্রিস্টাব্দের 15 জানুয়ারি প্রশান্ত মহাসাগরের আবিষ্কর্তা বালবোয়ার শিরচ্ছেদ করা হলো Acla-তে, সর্বজনসমক্ষে। অনেকে বলেন, এই বিচার সভায় প্রধান বিচারক ছিলেন পিজারো।

1এ, মুখার্জি পাড়া লেন, কলকাতা-26

সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট

মান : IX—X ডিসেম্বর 1986

1. সৌদি আরবের বৃহত্তম শহরটির নাম কি ?
2. সি. জি. এস পদ্ধতিতে 'ওহম-সেণ্টিমিটার' কিসের একক ?
3. 'পুলিৎজার পুরস্কার' এর প্রবর্তক 'জোসেফ পুলিৎজার' কে ছিলেন ?
4. এমন একটি যোগাসনের নাম কর, যেটি খাওয়া দাওয়া করার পর অভ্যাস করা উচিত।
5. পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাঁধ কোন্‌টি ?
6. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন কে ?
7. 62°F উষ্ণতায় 10 পাউণ্ড বিশুদ্ধ জলের আয়তন কত ?
8. Cl_2 লিখলে কি বোঝায় ?
9. নিউরোপ্লাজমের দানাদার অংশের নাম কি ?
10. ইউরোপের 'সিয়েরা নেভেদা' এবং ভারতের আরা ল্লী পর্বতমালা কোন্‌ শ্রেণীর পর্বত ?

সেপ্টেম্বর/86 তে প্রকাশিত 'সিনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট'-এর সমাধান।

1. ফরিদ খাঁ। 2. রামমোহন রায়। 3. অপসুর অবস্থান। 4. গার-সাসো। 5. জাপানের 'টোকিও'। 6. ককলিয়া। 7. ওভাম। 8. (গ) পিতল। 9. প্রথম শ্রেণীর লিভার। 10. সর্দার নিহাল সিং, 1908 খ্রীস্টাব্দে। 11. পতঙ্গ।

সেপ্টেম্বর 86তে প্রকাশিত সিনিয়ার ফটো ক্যুইজের সমাধান।

পারমাণবিক ঘড়ি

সিনিয়র ফটো ক্যুইজ

উত্তর আমেরিকাতেই এই গাছ বেশী দেখা যায়। গ্রীষ্মের শেষে এ গাছের পাতা উজ্জ্বল লাল অথবা হলুদ-বর্ণ ধারণ করে। এবং বীজগুলি তখন পড়ে মাটিতে। গাছটা চিনতে পারছ ?

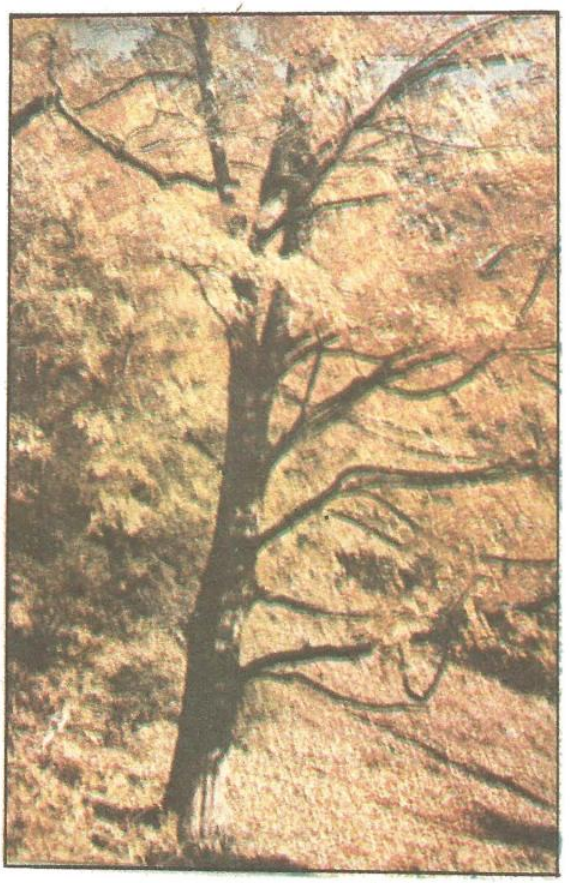

সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট—1986 এর সমাধান।

1. পেট্রোলিয়াম। 2. মুর্থা ও মুলা। 3. সরল বর্গীয় উদ্ভিদ। 4. 1930 খ্রীস্টাব্দ থেকে। 5. এডিলেড। 6. একটি পরমাণু থাকে। 7. 2টি উপগ্রহ আছে। 8. কোলিওরাইজা। 9. 1646 খ্রীস্টাব্দে তোরণা দুর্গ অধিকার। 10. যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)। 11. ভারতবর্ষ। 12. আয়ন বায়ু প্রত্যয়ন বায়ু ও মেরু বায়ু। 13. পশ্চিমবঙ্গে। 14 (ক) বাষ্পীভবন। 15. এক জুল = 10^7 আর্গ। 16. ইংলণ্ডের শেফিল্ড ফুটবল ক্লাব। 17. 22·38 সে.মি. হতে 22·86 সে.মি. এর মধ্যে। 18. দ্য পিপল্‌স্‌ ডেইলি। 19. সাঁচীস্তূপের ফটক। 20. রেড উড গাছ।

পদার্থবিজ্ঞানের কথা

অজয় চক্রবর্তী

স্থানভেদে একই বস্তুর ওজন বিভিন্ন হতে পারে—এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গত ভার-শূন্যতার কথা এসে পড়ে। তোমরা জানো, কৃত্রিম উপগ্রহে মহাকাশচারীরা থাকে ভারশূন্য অবস্থায়। মহাকাশচারীরা শূন্যে ভেসে বেড়াতে পারে। তার মানে কি এই যে, কৃত্রিম উপগ্রহের আরোহীদের টেনে নামানোর কোন আগ্রহই পৃথিবীর নেই? তাদের ওপর কি অভিকর্ষ বল ক্রিয়া করে না? চাঁদের ওপর পৃথিবীর বল না থাকলে চাঁদ কক্ষচ্যুত হয়ে মহাশূন্যের পথিক হতো। পৃথিবীর টানই চাঁদকে তার কক্ষপথে রাখে। কৃত্রিম উপগ্রহও একইভাবে পৃথিবীর আকর্ষণ-বলের ক্রিয়াধীন। তা সত্ত্বেও কৃত্রিম উপগ্রহের আরোহীরা ওজনহীন—এ আপাতবিরোধের মীমাংসা কি?

আসলে এখানে কোন বিরোধ নেই। ভারশূন্যতা প্রসঙ্গে একটা ভ্রান্ত ধারণা থেকেই এই বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। ধারণাটা হলো এই যে, কোন বস্তুর ওপর অভিকর্ষ বলের সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করলে বস্তুর ওজনের ক্রিয়া নাকচ হয়ে যাবে, ফলে বস্তুটি ভারশূন্য হবে। আসল ব্যাপার কিন্তু ঠিক তার উল্টো। ওজনের ক্রিয়ায় বাধা দিয়ে ওজনকে প্রতিমিত করে দিলে বস্তু ভার-শূন্য হয় না। ওজনের ক্রিয়া যতক্ষণ অবাধ ততক্ষণই বস্তুটি ভারশূন্য থাকে। ব্যাপারটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তুমি যখন মাটিতে পা রেখে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছো, তখন মাটি তোমার ওপর ঊর্ধ্বমুখী প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করছে। এ প্রতিক্রিয়া বল তোমার ওপর ক্রিয়া করে বলেই দেহের ওজন সম্পর্কে তোমার অনুভূতি জন্মে। ভূমির এ প্রতিক্রিয়া যদি কমানো যায় তবে ওজনের অনুভূতিও হ্রাস পাবে এবং হাল্কা বোধ হবে। আর, ভূমির এ প্রতিক্রিয়া যদি বাড়ে তবে মনে হবে দেহের ওজন বেড়ে গেছে। ভূমির প্রতিক্রিয়া যখন শূন্য তখনই ভারশূন্যতার অনুভূতি জন্মাতে পারে।

তোমরা যারা লিফ্টে চড়ে উঁচু বাড়িতে ওঠানামা করেছো তারা জানো যে, লিফ্ট যখন হঠাৎ ওপরে উঠতে থাকে তখন শরীরটাকে বেশি ভারী বলে মনে হয়। এর কারণ হলো এই যে, তোমার শরীরটাকে ত্বরণসহ ওপরে তোলার জন্য লিফ্টের ভূমি তোমার ওপর ওজনের অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে অর্থাৎ, লিফ্টের ভূমি তোমার ওপর যে-ঊর্ধ্বমুখী প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করছে তা ওজনের চেয়ে বেশি। ফলে তোমার মনে হবে, দেহের ওজন হঠাৎ বেড়ে গেল। আবার লিফ্ট যখন হঠাৎ নামতে শুরু করে তখন আরোহীর মনে হয় যে, তার ওজন কমে গেছে। এর কারণও একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। লিফ্ট যখন আরোহীর ওপর তার ওজনের চেয়ে কম মানের ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে তখন ওজনের অপ্রতিহত অংশের ক্রিয়ায় আরোহী ত্বরণসহ নিচে নামতে থাকে। লিফ্ট দেহের ওপর ওজনের চেয়ে কম মানের বল প্রয়োগ করছে বলেই আরোহীর মনে হয় তার ওজন কমে গেছে। আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন বস্তুর ওজনের বিরুদ্ধে যতো কম বল ক্রিয়া করবে বস্তুটিকে ততো বেশি হাল্কা মনে হবে এবং ওজনের বিরুদ্ধে যদি আদৌ কোন বল ক্রিয়া না করে তবে বস্তুটি ওজনহীন হবে।

ওজন যখন বস্তুর ওপর অবাধে ক্রিয়া করে তখন বস্তুটি অভিকর্ষজ ত্বরণে ভূ-কেন্দ্রের দিকে নামতে থাকে। সুতরাং বলা যায়, অভিকর্ষের টানে অবাধে পতনশীল বস্তুই ভার-শূন্য। ভাষান্তরে বলা যায়, কোন বস্তুতে তার ভার ছাড়া অন্য কোন বল ক্রিয়া না করলে বস্তুটি ভারশূন্য অবস্থায় থাকবে। সাঁতারু যখন ওপর থেকে 'ডাইভ' দিয়ে জলে পড়ে তখন পড়ন্ত অবস্থায় তার ভারশূন্যতার অনুভূতি জন্মে। হাতে ভারী বস্তু নিয়ে ওপর থেকে লাফিয়ে পড়লে পতনশীল অবস্থায় হাতের বোঝার ওজন অনুভূত হয় না। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, কোন বস্তুর ওপর যখন তার ওজন ছাড়া অন্য বলের ক্রিয়া নেই তখনই বস্তুটিকে ওজনহীন বলে মনে হয়।

তাহলে কৃত্রিম উপগ্রহের আরোহীর ভারশূন্যতার ব্যাখ্যা কী? উত্তরে বলা যায়, কৃত্রিম উপগ্রহটিও অভিকর্ষ ক্ষেত্রে অবাধে পতনশীল বস্তু। কোন বস্তু যখন একটি বৃত্তাকার পথে সুষম দ্রুতিতে ঘুরতে থাকে তখন বস্তুটির ওপর ত্বরণ ক্রিয়া করে, কেননা প্রতি মুহূর্তে বস্তুটির গতির অভিমুখ বদলায়। এ ত্বরণ বৃত্তপথের কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়া করে। কৃত্রিম উপগ্রহ যখন বৃত্তপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে তখন এর অভিকেন্দ্র ত্বরণ ক্রিয়া করে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে। পৃথিবীর আকর্ষণ বল বা অভিকর্ষ-বলই এ ত্বরণ সৃষ্টি করে বলে কৃত্রিম উপগ্রহের নিম্নমুখী (পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখী) ত্বরণ

অভিকর্ষজ ত্বরণের সমান। কাজেই, কৃত্রিম উপগ্রহটিও অবাধে পতনশীল বস্তু। পতনশীল বস্তু হয়েও যে কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীতে নেমে আসে না তার কারণ হলো এই যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে অভিকর্ষজ ত্বরণের প্রভাবে কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যতোটা নেমে আসবে কক্ষপথের স্পর্শক বরাবর এর বেগ থাকার ফলে এ বেগের দরুন ঐ সময়ের মধ্যে উপগ্রহটি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ঠিক ততোটাই সরে যাবে। এতে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে কৃত্রিম উপগ্রহটির দূরত্ব অপরিবর্তিত থাকবে।

অনেক সময় বলা হয়, 'তরলে ভাসমান বস্তু ওজনহীন'। ছাত্রপাঠ্য বিজ্ঞানের বইতে এ ধরনের উক্তি থাকে বলেও ভারশূন্যতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয় শিক্ষার্থীদের মনে। বুঝে দেখো, পতনশীল বস্তু যে-অর্থে 'ওজনহীন', তরলে ভাসমান বস্তু কখনোই সে-অর্থে ওজনহীন নয়। ভাসমান বস্তুর ওপর কেবল নয়, তরলের প্লবতাও ক্রিয়া করে। এক্ষেত্রে প্লবতা বস্তুর ওজনকে প্রতিমিত করে বস্তুকে ভাসমান অবস্থায় সাম্যে রাখে। কিন্তু ওজন প্রতিমিত হলেই কি বস্তু ওজনহীন হয়? তা যদি হতো, তবে তো টেবিলের ওপরে-রাখা পেপারওয়েটটাও ওজনহীন, কেননা এক্ষেত্রেও তো টেবিলের লম্ব-প্রতিক্রিয়া বস্তুর ওজনকে প্রতিমিত করে একে টেবিলের ওপর স্থির অবস্থায় রেখেছে।

তবে ভাসমান বস্তুকে ওজনহীন বলার পেছনেও একটা প্রচ্ছন্ন যুক্তি কাজ করে। যে-বস্তুর ওজন আছে তার নিচে নেমে যাবার প্রবণতা দেখা যায়। এরূপ বস্তুকে ওপরে বিধৃত অবস্থায় রাখতে হলে ওপরের দিকে বল প্রয়োগ করতে হয়। ভাসমান বস্তুকে বিধৃত রাখার জন্য কোন ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োজন হয় না বলে আপাতদৃষ্টিতে ভাসমান বস্তু ওজনহীন। অভিকর্ষ বল উপেক্ষা করে যখন কোন হাইড্রোজেন-ভরা বেলুন বায়ুতে ভাসতে থাকে তখন কে না বলবে 'ভাসমান বস্তু ওজনহীন'? তোমরাও বলো—আপত্তি নেই। কিন্তু ভাসমান বস্তুর ভারশূন্যতা আর পতনশীল বস্তুর ভারশূন্যতার প্রকৃতিগত পার্থক্যটা ভালো ভাবে বুঝে নিও।

জ্ঞানবিজ্ঞানের বই

1. জলের কথা ঃ প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত
2. ধাতুর কথা ঃ প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত
3. বাতাসের কথা ঃ প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত

শরৎ বুক হাউস
8B শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-73

বিজ্ঞান জগতে অধ্যাপক প্রতুল চন্দ্র রক্ষিত একটি সুপরিচিত নাম। যেমনি তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, তেমনি তাঁর সহজ সাবলীল ভাষা। জল, ধাতু ও বাতাস—তিনটিই আমাদের অতি পরিচিত ও অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। প্রতুল-বাবুর উপরোক্ত গ্রন্থ তিনটি পাঠ করলে আমরা অতি প্রয়োজনীয় ও অত্যাধুনিক তথ্যও জানতে পারব।

'জলের কথা' গ্রন্থে জলের উৎস, তুষার কাহিনী, সমুদ্রের কথা, সমুদ্র সম্পদ, নদীর কথা, মাটির নিচে জল, জলের শোধন, জলের স্বভাব, জলের রসায়ন ও ভারী জল সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে পারব। 'ধাতুর কথা' গ্রন্থ থেকে আমরা তাম্রযুগ থেকে লৌহযুগের ইতিহাস, প্রাচীন ভারতের ধাতু শিল্প, ধাতু উৎপাদন, দৈনন্দিন প্রয়োজনের ধাতু, সংকর ধাতু, বিরল ধাতু ও তেজস্ক্রিয় ধাতুর কথা জানতে পারব। আবার 'বাতাসের কথা' গ্রন্থ থেকে জানতে পারব—বাতাস, তার উপাদান, পরিমাণ ও বিস্তার, বায়ু মণ্ডলের তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়, আয়নো-স্ফিয়ার, মেরুজ্যোতি ও বায়ুদূষণের নানা অজ্ঞাত তথ্য।

আমার ধারণা যে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তো বটেই, বিজ্ঞান পড়েন নি এমন সাধারণ মানুষও এই বইগুলি পড়ে উপকৃত হবেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রতুল চন্দ্র রক্ষিতের কাছ থেকে আমরা এ ধরনের আরও কিছু রচনা আশা করব। প্রকাশক অধ্যাপক অমর দে 'বিজ্ঞান-কথা' সংগ্রহ' শীর্ষক একটি সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করে জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্য প্রচারে ব্রতী হয়েছেন এবং 'বিজ্ঞান-কথা সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত উপরোক্ত গ্রন্থ তিনখানি প্রকাশ করে বিজ্ঞান পিপাসু সকল মানুষের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। প্রতিটি গ্রন্থের মূল্য দশ টাকা। প্রতিটি গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। তবে 'জলের কথা' ও 'ধাতুর কথা' গ্রন্থ দু'খানির মত 'বাতাসের কথা' গ্রন্থটির প্রচ্ছদ মনোরম হয় নি। সাধারণ মানুষের কাছে সহজ কথায় বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতুলবাবু এবং অমরবাবুর এই যৌথ প্রচেষ্টা সফল হোক।

অমরনাথ রায়

পড়াশোনা

অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ

বিবেক রায়

লেবুর রস টক, দই টক, টক তেঁতুল ও ভিনিগার। কিন্তু এদের টক স্বাদের কারণ কি?—কারণ একটি মাত্রই এবং তা হলো এদের প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন অ্যাসিড থাকে। লেবুর রসে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে, দইতে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে, তেঁতুলে থাকে টারটারিক অ্যাসিড আর ভিনিগারে থাকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড। তাহলে দেখা যাচ্ছে—অ্যাসিড মাত্রই টক হয়। এ ভিন্ন, সমস্ত অ্যাসিডই নীল লিটমাসকে লাল করে। আর জৈবই হোক বা অজৈবই হোক্ সব অ্যাসিডের অণুতে প্রতিস্থাপন-যোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে। প্রতিস্থাপনযোগ্য এই হাইড্রোজেন, ধাতু অথবা ধাতুর মতন কোন মূলক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকরূপে প্রতিস্থাপিত হ'য়ে লবণ উৎপন্ন করে। এ ছাড়াও অ্যাসিড, ধাতুর অক্সাইড অথবা হাইড্রক্সাইড যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে। বিভিন্ন অ্যাসিডের অণুতে প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যাও বিভিন্ন হয়। কোন অ্যাসিডের একটি অণুতে একটি মাত্র প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু থাকলে (যেমন HCl), তাকে এক-ক্ষারিক অ্যাসিড, দুটি প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু থাকলে (যেমন H_2SO_4), তাকে দ্বি-ক্ষারিক অ্যাসিড এবং তিনটি অনুরূপ হাইড্রোজেন পরমাণু থাকলে (যেমন H_3PO_4), তাকে ত্রি-ক্ষারিক অ্যাসিড বলে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। সব অ্যাসিডেই হাইড্রোজেন থাকে একথা সত্যি, তাই বলে হাইড্রোজেনের যৌগ মাত্রেই (যেমন CH_4 বা মিথেন) কিন্তু অ্যাসিড নয়। জলও (H_2O) তেমন একটি যৌগ। CH_4 অথবা H_2O হাইড্রোজেন সমন্বিত যৌগ হলেও অ্যাসিড নয়। কারণ এদের মধ্যে অ্যাসিডের অনুরূপ প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু নেই। অনেক ধাতুই অক্সাইড এবং হাইড্রক্সাইড যৌগ গঠন করে। যেমন ধর ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) ও ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Ca(OH)_2$]। এরা একই ধাতু ক্যালসিয়ামের দুটি বিভিন্ন যৌগ। ধাতব অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইড যৌগগুলিকে সাধারণভাবে 'ক্ষারক' বলা হয়। ক্ষারকেরা অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল গঠন করে। আর ক্ষারকদের মধ্যে যেগুলি (বিশেষ করে কিছু কিছু ধাতব হাইড্রক্সাইড) জলে দ্রাব্য। জলে দ্রাব্য, এমন ক্ষারকগুলিকে 'ক্ষার' বলা হয়। কস্টিক সোডা (NaOH), কস্টিক পটাশ (KOH) ইত্যাদি যৌগগুলি ক্ষার।

ক্ষারের সঙ্গে অ্যাসিডের তীব্রভাবে বিক্রিয়া ঘটে এবং তার ফলে লবণ ও জল উৎপন্ন হয়। ক্ষারের জলীয় দ্রবণ পিচ্ছিল হয় এবং লাল লিটমাসকে নীল করে। তবে হ্যাঁ, মনে রেখো—'সব ক্ষারকই ক্ষার নয়, কিন্তু সব ক্ষারই ক্ষারক'। আগেই বলেছি—অ্যাসিডের সঙ্গে ক্ষার বা ক্ষারকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় লবণ ও জল। যেমন ধর, কস্টিক সোডা (NaOH) ক্ষারের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের (HNO_3) বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$) নামক লবণ আর জল। কাজেই লবণ বলতে শুধু খাদ্যলবণ (NaCl)-কেই বোঝায় না। বোঝায় একাধিক যৌগকে—যারা অ্যাসিডের সঙ্গে ক্ষার বা ক্ষারকের বিক্রিয়ায় জলের সঙ্গে অপর যৌগরূপে উৎপন্ন হয়। পটাসিয়াম ফসফেট, সোডিয়াম বাই সালফেট, ফেরিক ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি অজস্র লবণের নাম করা যেতে পারে। রসায়নের বিচারে অ্যাসিড এবং ক্ষারক, ধর্মের দিক থেকে একে অপরের বিপরীত। সেই কারণে অ্যাসিড ও ক্ষারক বা ক্ষার উপযুক্ত মাত্রায় পরস্পরের সংস্পর্শে এলেই লবণ ও জল গঠন করে। লবণ প্রশম, জলও প্রশম। তার ফলে উৎপন্ন পদার্থগুলিও প্রশম হয়। তাদের কোনটিতেই অ্যাসিড বা ক্ষারের ধর্ম বিদ্যমান থাকে না—এই রকম বিক্রিয়ায় ক্ষারক বা ক্ষার অ্যাসিডের অম্লত্বকে প্রশমিত করে। এই কারণে এই ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে বলা হয় 'প্রশমন ক্রিয়া'। প্রশমন ক্রিয়ায় অ্যাসিডের অন্তর্গত প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেনের সঙ্গে ক্ষার বা ক্ষারকের হাইড্রক্সিল (OH) মূলক বা অক্সিজেন পরমাণুর (O) পূর্ণ রাসায়নিক সংযোগ ঘটে জল ও প্রশম লবণ গঠিত হয়। উপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ (নির্দেশক) ব্যবহার করে আমরা পরীক্ষাগারে অ্যাসিড ও ক্ষারের প্রশমন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার সঠিক মুহূর্তটিকে নির্ণয় করতে পারি।

এন. বি. টি.—99A, নিউট্রাফিক খড়্গপুর।

নিজে নিজে কর

মজার ইলেকট্রনিক্স প্রোজেক্ট

পার্থসারথি চক্রবর্তী

মজার রেডিও সুইচ

তুমি দিব্যি ভারি মনোযোগ দিয়ে রেডিওর প্রোগ্রাম শুনছ—ঠিক এমন সময় হয়ত বিজ্ঞাপন কার্যক্রম আরম্ভ হয়ে গেল, যেটা তোমার আদৌ পছন্দ নয়। তখন তোমার রেডিও শোনার সুন্দর আমেজটাই যায় মাটি হয়ে—তাই না? আচ্ছা, আমাদের মজার ইলেকট্রনিক্স প্রোজেক্ট কায়দা করে করতে পারলে তোমার আর কোন অসুবিধা হবে না। তুমি খুশি মতো কতকগুলি ইলেকট্রনিক উপকরণ ব্যবহার করে এই দুর্বিষহ বিজ্ঞাপনের গলা ফাটানো আওয়াজের হাত থেকে রেহাই পেতে পার। এই মজার মডেলটা তৈরি করতে বিশেষ খরচ-পত্তরও হবে না। তোমার শুধু চাই ধৈর্য আর কতকগুলি জিনিস যোগাড় করে নিয়ে আসা। ব্যস, তারপর লেগে যাও আমার সঙ্গে বসে এই চমৎকার ইলেকট্রনিক্স প্রোজেক্ট তৈরি করতে। এই রেডিও সুইচকে যেখানে খুশি রাখা চলবে—টেবিলে, এমন কি সম্ভব হলে তোমার বিছানার পাশেও। এর উপকরণগুলিকে একটা ছোট ট্যাগ বোর্ডে ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্স সহযোগে লাগাতে পার। এই ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্সের ডায়াল আগে থেকে সময়ের রিডিং নিয়ে (বিভিন্ন ডায়াল পজিশনে অবশ্যই) Calibrated করা যায়।

AC128 ট্রানজিসটর যাতে অযথা গরম হয়ে না যায় সেজন্য আর একটা ট্রানজিসটর AC128 সংযোগ করা যেতে পারে অর্থাৎ বেস থেকে বেস, কালেকটর থেকে কালেকটর, এমিটর থেকে এমিটরে (টুইন হিট সিংক সহ)। প্রয়োজনীয় বর্ধিত কারেন্ট যেন 15mA এর বেশি না হয়।

ভাল্‌ব রেডিওর জন্য একটা রিলে সুইচ (স্প্রিং টেনসন এ্যাডজাস্টমেণ্ট শুদ্ধ) ব্যবহার করা যেতে পারে। পুশ্‌ বাটন থাকবে একটা লম্বা তারের সঙ্গে আটকানো, এতে কাজের খুবই সুবিধা হবে। একটা রিলে সুইচের মাধ্যমে যখন তোমার রেডিও সেটটা অফ্‌ হয়ে যাচ্ছে সেই সময় ইচ্ছে করলে টেপ রেকর্ডার অথবা রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে গান অথবা কোনও বাজনা শুনতে পারো।

কিভাবে কাজ করে রেডিও সুইচ

যখন তুমি পুশ বাটন-এ চাপ দিচ্ছ তখন কনডেনসার চার্জড হয়ে যাবে 10 ওহম রেজিসটরের মাধ্যমে। এর ফলে NPN ট্রানজিসটর কাজ করবে এবং পয়েণ্ট A-কে সুবিধা মতো ground potential-এ নিয়ে আসবে অবশ্যই PNP ট্রানজিসটরকে বাধা দিয়ে। BC-এর রেজিসট্যান্স এখন অসীম। এই অবস্থা চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কনডেনসার চার্জড না হয়। কিন্তু কনডেনসার (ভ্যারিয়েবল রেজিসটর দিয়ে কণ্ট্রোল করা হচ্ছে) আস্তে আস্তে ডিসচার্জ করতে থাকবে। যখন ওটা সম্পূর্ণরূপে ডিসচার্জ করে যাবে তখন NPN ট্রানজিসটর অবশ্যই বাধা দেবে এবং পয়েণ্ট A-কে আগেকার পোটেনসিয়ালে নিয়ে আসবে। এর ফলে PNP ট্রানজিসটর conducting হয়ে উঠবে।

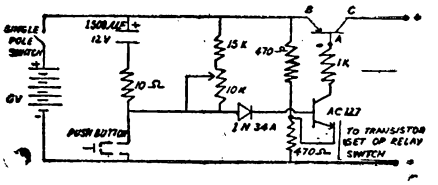

কি কি জিনিস চাই

½ ওয়াট রেজিসটর; 10 ওহম; 15K ওহম্‌। 470 ওহম্‌—দুটো 1k ওহম্‌; ভ্যারিয়েবল রেজিসটর: 10K ওহম্‌; কনডেনসার 1500μF অথবা OA 10; ট্রানজিসটর AC 128 (PNP, AC 127 (NPN)। সুইচ—সিংগল পোল রিলে সুইচ, পুশ বাটন, ট্যাগ বোর্ড, সলডার, ইলেকট্রিক তার ইত্যাদি।

পার্থসারথি চক্রবর্তীর

নতুন বই

বুদ্ধি নিয়ে খেলা

শীগগীর প্রকাশিত হবে

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-9

সময়ের উৎস সন্ধানে

ডঃ শংকর সেনগুপ্ত

অনেক দিন পর্যন্ত মানুষ পৃথিবীকে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় বস্তু বলে ভেবেছে। তাদের কাছে পৃথিবী ছিল স্থিতিশীলতার প্রতীক। কিছুকাল আগেও পশ্চিমী মানুষের মনে ধারণা ছিল যে সৃষ্টি হবার পর থেকে পৃথিবীর কোন কিছুই পাল্টায়নি বা পাল্টাবে না। তাদের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশ, পাহাড় ইত্যাদি সব কিছুই চিরন্তন। সৃষ্টির আদিকাল থেকে নদী তার যাত্রা-পথে অবিরাম বয়ে চলেছে এবং চলবে। তাদের যুক্তিতে এই নিয়মের মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বন্যার আবির্ভাব কোন দৈবশক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

প্রাচীন মানুষের চিন্তার মধ্যে ধর্মীয় প্রভাব প্রবল মাত্রায় ছিল। কোন রকম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ধর্মের ওপরে হস্তক্ষেপ বলে ধরা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এক ফরাসি চিন্তাবিদ্ এই মতবাদ চালু করার চেষ্টা করলেন যে বাইবেলে সৃষ্টির যে ছয়টি দিনের উল্লেখ আছে আসলে তারা ছয়টি বড় সময়সীমা বোঝায়। ধর্মীয় অনুশাসনে শেষ পর্যন্ত তাঁকে এ-ধরনের নতুন চিন্তা ত্যাগ করতে হয়েছিল।

এশিয়া মহাদেশের মানুষরা পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে কিছুটা বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা করত। হিন্দুদের মধ্যে এমন বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবী দু'হাজার মিলিয়ান বছরের পুরানো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কিন্তু পশ্চিমী দেশের পণ্ডিতেরা তাদের মনোভাব পাল্টালেন। কৌতূহল নিয়ে তাঁরা তাঁদের চারিপাশের পৃথিবীকে দেখতে শুরু করলেন নতুন করে। লক্ষ্য করতে করতে তারা শেষ পর্যন্ত অনেক সূত্র পেলেন যার থেকে প্রমাণিত হলো আমাদের দৃষ্টিগোচর পৃথিবীতে বড় বড় পরিবর্তন নিয়ত ঘটে চলেছে। তটরেখা কোথাও বা এগিয়ে যাচ্ছে কোথাও বা আসছে পেছিয়ে। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের ধারাটি বছরে কয়েক ফুট করে ক্ষয় পাচ্ছে। পর্বতশীর্ষ কখনও বা আনত হচ্ছে কখনও বা সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সমতলভূমি কোথাও বা আরও বিস্তীর্ণ হচ্ছে কোথাও বা নতুন করে জন্ম নিচ্ছে দ্বীপ। যেসব ভূ-বিজ্ঞানীরা এইসব চিন্তা শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন পথিকৃত হলেন জেমস্ হাটন। দীর্ঘদিন পৃথিবীর বুকে যে পরিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে মানুষের চোখের সামনে তা ক্রমশ প্রকাশ হতে লাগল। বৃষ্টি, তুষার, নদ-নদী, সমুদ্র, পৃথিবীর গতি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এরা সবাই কোন না কোন ভাবে পরিবর্তনের প্রতিভূ। তবে পরিবর্তনের প্রকৃত স্বরূপ কিন্তু একটি মানুষের জীবনে দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে।

কেমন করে চারিপাশে পরিবেশ বদলাচ্ছে তা বুঝতে গেলে ভূ-বিজ্ঞান ও পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কাল সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। ভূ-বিজ্ঞানে বিভিন্ন কাল বোঝাতে যে সময়সীমা ব্যবহার করা হয় তা বিরাট। এই বিরাট পরিমাণ সময়ের কথা মনে রাখলেই সবাই বুঝতে পারবেন যে পৃথিবী কি ধীর গতিতেই না পাল্টাচ্ছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত জীবাশ্ম বা ফসিল সম্পর্কে মানুষের মনে ভুল ধারণা ছিল। কেউ কেউ ভাবতেন ফসিল মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তানের কারসাজি। কেউ বা বলতেন বাইবেলে যে বন্যার উল্লেখ আছে ফসিল তারই সাক্ষী। ১৭০৬ সালে আমেরিকায় একটা ছয় ইঞ্চি লম্বা দাঁত পাওয়া যায়। এই দাঁতটি হলো হাতির মতন অধুনালুপ্ত এক ধরনের প্রাণীর। প্রথমে কিন্তু ভাবা হয়েছিল যে দাঁতটি কোন বিরাটকায় মানুষের। পৃথিবী সম্বন্ধে

আগ্রহী মানুষ তখন পর্যন্ত এ-ধরনের অসংলগ্ন চিন্তা করতেন।

পৃথিবীর পরিবেশ যে নিয়ত বদলে যাচ্ছে তা বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে প্রমাণ করেন জেমস্ হাটন ও চার্লস লাইয়েল। উইলিয়াম স্মিথ নামে একজন ব্রিটিশ ভূ-বিজ্ঞানীও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। পেশায় তিনি ছিলেন এক যন্ত্রবিদ্। কিন্তু তাঁর নেশা ছিল জীবাশ্ম বা ফসিল সংগ্রহ করা। নিজের কাজে অনেক খাল কাটার সময় তিনি নানান ধরনের ফসিল সংগ্রহ করেন ও যে সব পাহাড়ে তাদের পাওয়া গেছে সেসব পাহাড় সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি দেখালেন যে পাললিক শিলা (Sedimentary rock) হচ্ছে সবচেয়ে পুরানো পর্বত স্তর। এর পর তিনি উপরিপাত সূত্রের (Law of superposition) অবতারণা করেন। এই সূত্রের বক্তব্য হলো যে পৃথিবীর ভেতরে কোন আলোড়ন না হলে অর্থাৎ পাললিক শিলা স্তরের বিচ্যুতি না ঘটলে পাললিক শিলা স্তর সবচেয়ে নিচে থাকে। এর ওপরে অপেক্ষাকৃত নতুন স্তর জমা পড়ে। এইভাবে স্তরের বিন্যাস চলতে থাকে। উদাহরণ হিসাবে তিনি দেখান খড়িমাটির স্তর সব সময় কয়লার স্তরের ওপরে থাকবে, নিচে কখনই নয়। অবশ্য আগ্নেয় শিলা (গলিত লাভা জমাট বেঁধে যে শিলা তৈরি) এই নিয়মের আওতায় পড়বে না। কেননা পাললিক শিলাস্তরের মধ্যে এদের অনুপ্রবেশ যে কোন সময়ই ঘটতে পারে।

স্মিথ আরও আবিষ্কার করলেন যে ফসিলের চরিত্র ও পর্বতের যে স্তর থেকে তাদের পাওয়া যায় তাদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পাললিক পর্বতের প্রতিটি স্তরে যে ফসিল পাওয়া যায় তাদের প্রত্যেকের আপন আপন বৈশিষ্ট্য আছে। কিছু কিছু ফসিল বিভিন্ন স্তরে পাওয়া যায়, কিছু কিছু ফসিল কেবল একটি নির্দিষ্ট স্তরেই থাকে। সক্রিয় পরিবর্তনের কথা না বুঝলেও স্মিথ কিন্তু ফসিলের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে যাদের তিনি নির্দেশক ফসিল (Index ফসিল) বলতেন। এরা কেবল নির্দিষ্ট স্তরেই থাকে। যদি দেখা যায় যে ভিন্ন জায়গার দুটি পর্বতস্তরে এক ধরনের নির্দেশক ফসিল পাওয়া যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যে পৃথিবীর ইতিহাসের একই সময়কালে পর্বত দুটি সৃষ্টি হয়েছিল। আপতন সূত্রের সাহায্যে পর্বতের আপেক্ষিক বয়স নির্ধারণ করা সম্ভ হলো। অবশ্য কেউ জানত না যে কি হারে পালালক শিলা জমা পড়েছে। জমা পড়ার হার নির্ভর করবে আবহাওয়া, সামুদ্রিক পরিবর্তন ইত্যাদির ওপর। সুতরাং জমা পড়ার হার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন হতে পারে। পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে পর্বত সৃষ্টির পুরো ইতিহাসটুকু পাওয়া সম্ভব। বেশির ভাগ জায়গাতেই পাললিক পর্বতের গঠন নানান উত্থান পতন ও ক্ষয়ের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এইসব প্রাকৃতিক ঘটনা পর্বত স্তরের যতখানি পুরুত্ব হবার কথা তা হতে দেয়নি। তাই পাললিক পর্বতের পুরুত্বের ওপর নির্ভর করে ভূ-বিজ্ঞানে যে সব সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে তা সব জায়গায় সমান হয়নি।

পর্বতের ত্বক ও চরিত্রের ওপর নির্ভর করে কোন সূত্র ঠিক খাড়া করা যায় না। একই সময়কালীন পর্বত দুটি ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন হতে পারে। ল্যাটিন ভাষায় ক্রেটা (creta) শব্দটির অর্থ হলো খড়িমাটি (chalk)। যে সময়ে প্রধানত খড়িমাটির পর্বত সৃষ্টি হয়েছিল ভূ-বিজ্ঞানে তাকে বলে ক্রেটেসাস্ (cretaceous period) সময়কাল। অবশ্য ক্রেটেসাস্ সময়কালে সৃষ্ট এমন সব পর্বতের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের মূল উপাদান খড়িমাটি নয় সুতরাং ফসিলের সাহায্য ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় সময়কালের পারম্পর্য বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব।

কি ধরনের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে তার ওপরে নির্ভর করে ভূ-বিজ্ঞানীরা পর্বতের শ্রেণী বিভাগ করেছেন। ফসিল হলো প্রাচীন উদ্ভিদ বা প্রাণীদের অস্তিত্বের স্বাক্ষর। এই সব উদ্ভিদ বা প্রাণী পাললিক স্তরে চাপা পড়ে ধীরে ধীরে ফসিলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। অবলুপ্ত বহু প্রাণীর অস্তিত্ব ধরা পড়ে ফসিলের মাধ্যমে। কিছু কিছু প্রাণীর পুরো আকৃতিরই ফসিল পাওয়া যায়। যদিও এধরনের আবিষ্কার খুবই বিরল ঘটনা। যখন কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী মারা যায় তখন তা নানাভাবে ক্ষয় পেতে থাকে। ফসিল হতে গেলে শরীরে কিছু শক্ত অংশ থাকা দরকার যা মাটির নিচে চাপা পড়ে অবিকৃত থাকতে পারে। এই কারণে শক্ত হাড় নেই এমন সব প্রাণীদের ফসিল পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। প্রাণীদের শক্ত অংশগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিশে গেলে যে গর্তের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে মাটি জমা পড়ে প্রাণিদেহের ছাপ তৈরি হয়ে যায়। কোন কোন সময় দেখা যায় যে প্রাণিদেহের শক্ত অংশগুলি যেখানে ছিল সেখানে সিলিকা বা পাইরাইট জমা পড়েছে। কিছু কিছু ফসিল আবার এমন ছাঁচে হয় যে প্রাণিদেহের বাইরের গঠন পুঙ্খনাপুঙ্খ ভাবে বুঝতে পারা যায়। পায়ের ছাপ ও প্রাণীদের চলাচল ধরা পড়েছে ফসিলের মধ্যে। যেখানে এদের পাওয়া যায় সেখানকার পর্বত স্তর সম্ভবত নরম ছিল। এই নরম স্তর সূর্যের তাপে শক্ত হতে হতে শেষ শর্যন্ত নতুন স্তর দিয়ে ঢাকা পড়ে গেছে। ভূ-বিজ্ঞানীরা এমন সব ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন যাদের সাহায্যে ঐসব প্রাণীদের খাওয়ার ধরন কিরকম ছিল তা জানা যায়।

আমরা জানি যে পৃথিবীর তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল। তাই সমুদ্রে বসবাসকারী প্রাণীদের সংখ্যা স্থলে বসবাসকারী প্রাণীদের চেয়ে বেশি। সেই কারণে সামুদ্রিক প্রাণীদের ফসিল স্থলের প্রাণীদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি

পাওয়া যায়। সামুদ্রিক প্রাণীদের ফসিল ভূবিজ্ঞানীদের কাছে খুবই অর্থপূর্ণ। এর কারণ এইসব ফসিল পৃথিবীর অনেকটা স্থান জুড়ে থাকে বলে বিভিন্ন জায়গায় পর্বত স্তরের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া প্রাণীগুলি কি গরম আবহাওয়া বা ঠাণ্ডা জলবায়ুতে বসবাস করত কিংবা তারা ডাঙায় বাস করত না জলে বাস করত, এইসব তথ্য অনুসন্ধান করে এইসব স্থানের তখনকার আবহাওয়া এবং অন্যান্য ভৌগোলিক তথ্য জানা যায়।

কোন শিলাস্তরে পাওয়া ফসিলের সাহায্যে সেই শিলাস্তরের একটা মোটামুটি বয়সসীমা আন্দাজ করা যায় কিন্তু কখনই তার চরম বয়সসীমা নির্ধারণ করা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পণ্ডিতেরা বুঝতে পারলেন পৃথিবী অতি প্রাচীন। কিন্তু তাদের হাতে এমন কোন উপায় ছিল না যার সাহায্যে পৃথিবী বা পর্বতের সঠিক বয়স নির্ণয় করা যেতে পারে। কিছু কিছু বিজ্ঞানী পালিক পর্বত স্তরের সর্বোচ্চ পুরুত্ব থেকে পৃথিবীর বয়স হিসাব করার চেষ্টা করলেন। কেউ কেউ সমুদ্রে মোট যে পরিমাণ লবণ আছে ও প্রতি বছর যে পরিমাণ লবণ জমা পড়ছে সেই পরিমাণ থেকে সময় নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে তারতম্য দেখা গেল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তেজস্ক্রিয়তা (radio-activity) আবিষ্কৃত হয়। রাদারফোর্ড দেখালেন যে প্রতিটি তেজস্ক্রিয় বস্তু নির্দিষ্ট হারে এবং নির্দিষ্ট সময়ে লয়প্রাপ্ত হয়ে অন্য বস্তুতে পরিণত হয়। যেমন ইউরেনিয়াম নির্দিষ্ট হারে লয়প্রাপ্ত হয়ে সাধারণ সীসায় পরিণত হয়। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম এদের সাহায্যে পর্বতের বয়স নির্ণয় করা যায়। যেমন কোন পর্বত স্তর থেকে পাওয়া এক খণ্ড ইউরেনিয়ামের মধ্যে সীসার ভাগ কতখানি তা থেকে পর্বতের বয়স নির্ধারণ করা যায়। সীসার ভাগ বেশি হলে পর্বতের বয়স বেশি হবে এবং কম হলে বয়স কম হবে। তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে প্রতিপন্ন হয়েছে যে যাকে আমরা ক্যামব্রিয়ান কাল বলি তা শুরু হয়েছিল ৫৭০ মিলিয়ন বছর আগে এবং পৃথিবী জমাট বাঁধতে আরম্ভ করেছিল প্রায় ৪,৫৫০ মিলিয়ন বছর আগে। পৃথিবীর ইতিহাসের ৫৭০ মিলিয়ান বছরকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) প্যালিওজোইক (Palaeozoic) বা প্রাচীন (২) মেসোজোইক (Mesozoic) বা মধ্য জীবন (৩) সিনোজোইক (Cinozoic) বা নতুন জীবন। এই সময়সীমাগুলিকে আবার আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন ক্যামব্রিয়া (Cambria) জুরাসিক (Jurasic) বা ডেভোনিয়ান (Devonian)। এইসব সময়সীমার নামগুলি বিভিন্ন জায়গার নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এছাড়া প্রাচীন জাতিদের নাম থেকে কিছু কিছু সময়-সীমার নাম দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে সিলুরিয়ান (Silurian), ওরডোভিনিয়ান আবার যে সময় যে পর্বত বেশি পাওয়া যায় তার নাম অনুসারেও সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন ক্রেটেসাস (cretaceous) অর্থাৎ এই সময়কার পাহাড়গুলি প্রধানত খড়িমাটি দিয়ে তৈরি ও কার্বনিফেরাস (carboniferous) অর্থাৎ সময়কালে প্রাপ্ত পাহাড়গুলি মূলত কয়লা দিয়ে তৈরি। কিছু কিছু বিজ্ঞানী আবার বিগত ৫৭০ মিলিয়ান বছরকে চার ভাগে ভাগ করে থাকেন। এই চারটি ভাগ হল প্রাইমারি (Primary), সেকেণ্ডারী (Secondary), কোয়ারটারনারি (Quarternary) টারসিয়ার (Tersiary) এবং প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারি হল যথাক্রমে প্যালিওজোইক এবং মেসোজোইক। টারসিয়ারি এবং কোয়ারটারনারিকে সিনোজোইক কালের দুটি স্তর হিসাবে ভাবা হয়।

ভূবিজ্ঞানের একটি রহস্যজনক ব্যাপার হলো ক্যামব্রিয়ান সময়-সীমায় যে সব পর্বত আছে তাদের থেকে পাওয়া ফসিল অনেক উচ্চতর জীবের উপস্থিতির সন্ধান দেয়। কিন্তু প্রিক্যামব্রিয়ান যুগে অর্থাৎ ক্যামব্রিয়ান যুগের আগের যে সব পর্বত স্তর তাতে কোন উন্নত জীবের সন্ধান পাওয়া যায় না।

যদিও ক্যামব্রিয়ান যুগের আগে পর্বত বা আগ্নেয়গিরি তৈরি হবার কিছু কিছু প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তবুও বলা চলে যে ক্যামব্রিয়ান যুগের পর থেকেই আমরা পৃথিবীতে যে পরিবর্তনের লীলা সংঘটিত হয়ে চলেছে তার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারি। প্যালিওজোইক কালে অমেরুদণ্ডী প্রাণী মাছ, উভচর, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরা প্রাধান্য পেয়েছিল। মেসোজোইক কালে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল সরীসৃপ আর ডাইনোসেরাসের মত বড় বড় প্রাণীরা। বৃহদাকার সরীসৃপেরা মেসোজোইক কালের শেষের দিকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সিনোজোইক কালে হলো মানবজাতির উন্মেষ।

পৃথিবীর ইতিহাসে ঠিক কোন সময়টিতে আজকের মানুষ তার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে তা বলা কষ্ট। মোটামুটি হিসাব করে দেখা গেছে যে, যদি আমরা পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসকে এক বছরের মধ্যে সীমিত করি তাহলে বছরের শেষ দিনটির একশো কুড়ি দিন আগে ব্যাকটিরিয়া জন্ম নিয়েছে। মানবজাতির আদিপুরুষ এসেছে বছরের শেষ দিনটির সম্পূর্ণ হবার দু'ঘণ্টা আগে আর বর্তমান মানুষ আবির্ভূত হয়েছে দিন শেষ হওয়ার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে।

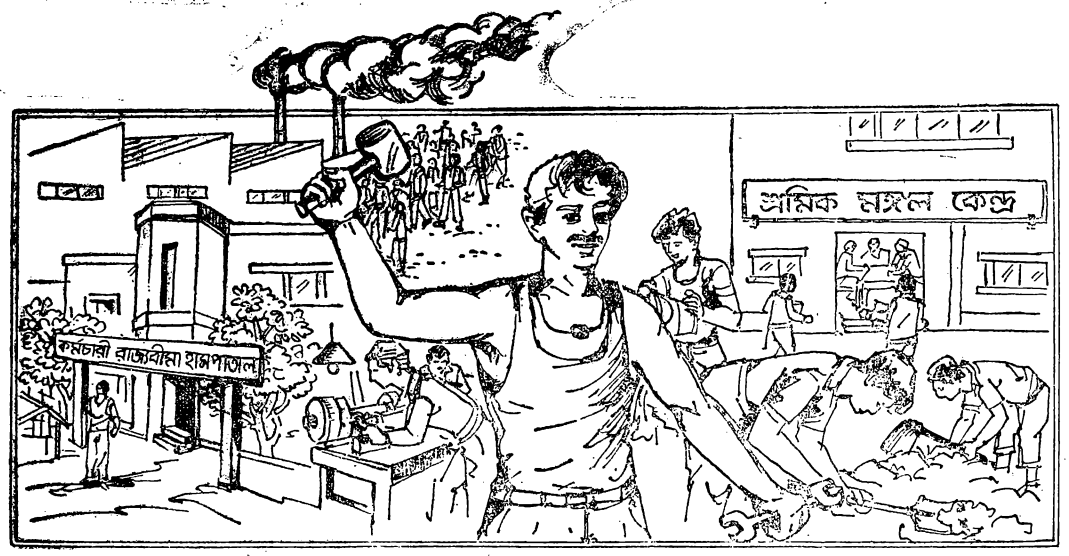

বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য: শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষিত করা, সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখা

১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বামফ্রন্ট সরকার শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য আর্থিক প্রাপ্য, নিরাপত্তা ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করার দিকে লক্ষ্য রেখে নীতিনির্দ্ধারণ ও কর্মসূচী প্রণয়ন করে চলেছেন। বামফ্রন্ট সরকার চান শ্রমিক বাঁচুন সুন্দর জীবন নিয়ে, সংগ্রাম করুন সুন্দরতর জীবনের জন্যে, আবার শিল্প বাঁচুক অধিকতর উৎপাদন নিয়ে।

বামফ্রন্ট সরকার একদিকে বিরোধ-নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করে পাট, চা, হোসিয়ারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিল্প-ভিত্তিক এবং বহু-কারখানা-ভিত্তিক ত্রিপাক্ষিক মীমাংসার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের মজুরী ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন, অন্যদিকে দেশব্যাপী রুগ্ণ ও বন্ধ শিল্পের ভয়াবহ সমস্যার রাজ্যভিত্তিক মোকাবিলার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়েছেন। এ পর্য্যন্ত তেরটি বন্ধ কারখানা রাজ্যসরকারের পরিচালনায় চালু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ডি-নোটিফাই করে দিয়েছেন এবং লিকুইডেশনের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এমন কারখানাগুলিও খোলার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন। গুরুত্বপূর্ণ শ্রম-আইনগুলি সংশোধন করে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছেন।

শ্রমজীবী মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতির সফল রূপায়ণের নজির হিসেবে বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের নানা-ব্যবস্থা নিয়েছেন। ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারিত করা হয়েছে ৩৫টি কর্মক্ষেত্রে। রাজ্যবীমা প্রকল্পের অধীনে ২১টি সার্ভিস ডিসপেনসারী, ৩টি নতুন হাসপাতাল (মোট ১২টি) ও ১৬টি নতুন ঔষধালয় (মোট ৫১টি) খোলা হয়েছে। হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা প্রায় ১০০০ বাড়ানো হয়েছে এবং ১২,৭৫,০০০ শ্রমিক পরিবারকে রাজ্যবীমা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। দেশব্যাপী ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে বেকার যুবকযুবতীদের মর্যাদা ও স্বীকৃতিদানের জন্য চালু হয়েছে বেকারভাতা প্রকল্প, যাতে এ পর্য্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৬ কোটি টাকা এবং উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৭ লাখ বেকার। বেকার যুবকযুবতীদের স্বনির্ভর হয়ে ওঠায় সাহায্য করার মানসে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮৫ সালে একটি নতুন স্বনিযুক্তি প্রকল্পও চালু করেছেন এবং এতে ইতিমধ্যেই উপকৃত হয়েছেন ১৯০০ বেকার। শিল্প শ্রমিকদের জন্য দীঘায় ও দার্জিলিং-এ দুটি হলিডে হোম খোলা হয়েছে এবং ৫০টি শ্রমিকমঙ্গল কেন্দ্রের কাজকর্ম অধিকতর কল্যাণমুখী ও ব্যাপক করে তোলা হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে থেকে তাঁদের এক উন্নততর জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই অঙ্গীকার থেকে আমরা বিচ্যুত হব না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

UPCO/86

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

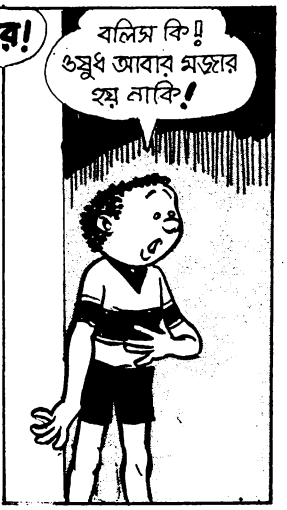

KJB Dec/8616

হোয়ার্ক!
দুড়ুম-
হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ-
বাপরে, এ কি রকম ওষুধ!
এ বোতল বোম্ তুই কোথা থেকে জোগাড় করলি?
জোগাড় নয়, তৈরী করেছি। একে তুই গ্যাস বোম্ও বলতে পারিস।
কেমন— জিনিসটা মজার নয়? এটা তৈরী করা খুব সোজা।
কোন খরচা নেই, এর মাল মশলা তুই ঘরেতেই পাবি। প্রথমে একটা শিশি নিবি, ওতে কিছুটা চুন সোডা আর সামান্য জল দিয়ে বেশ করে ঝাঁকাবি
ওটা কি খাবার সোডা দেবো?
এটা কি কোন খাদ্য বস্তু তৈরী হচ্ছে যে খাবার সোডা দিবি, মুখ্যু!
বুঝেছি, কাপড় কাচা সোডা।
হ্যাঁ, সোডিয়াম কারবনেট। এবার সিগারেটের প্যাকেটে যে রাংতা থাকে সেই রাংতা ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে ঐ শিশির মধ্যে বেশ কয়েকটা দিবি। ব্যাস্।
ফাটবে কখন?
আ-মোলো যা! একি পটকা নাকি যে আগুন দেওয়া মাত্র দুড়ুম্ পটাশ! এ হচ্ছে গ্যাসীয় ধ্বনি, সুতরাং ওয়েট্ করতে হবে।
আবার ওয়েট করতে হবে! কতক্ষণ?
DEC. 86.

খানিক পরেই দেখবি ভিতরে কেমন বুদ্বুদগুড়ি কাটছে এবং শিশিটাও গরম হয়ে উঠেছে, তখন ঐ কর্কটা চেপে বসিয়ে দিবি। একটু পরেই দেখবি—
ফট্—
তারপর আবার কর্কটা চেপে বসিয়ে দিবি আবার চুমু। এই ভাবে যতবার বসাবি ততবারই চুমু, দাম, ফটাস হবে।
বাঃ!
এর কারণ হল—চুন সোডা আর ঐ রাংতা অর্থাৎ দস্তা একত্রে একটা গ্যাস তৈরী হয়। ঐ গ্যাসটাই—
ভেটু!
কর্ক ঠেলে বেড়িয়ে আসে, তখন শব্দ হয়।
কে কে?
বলি আমার মিকশ্চারের শিশিটা এখানে কে আনলো?
ভেটু ওটা—
সর্বনাশ! শিশির মধ্যে এ সাদা পদার্থটা এলো কোত্থেকে? আমার তো লাল রঙের ওষুধ ছিল!
এই বার তোমার সব গ্যাস বের করবে খুদে।
ভেটু ওটা তোমার নয়! ওখান থেকে সরে যাও নইলে ওটা এখুনি—

এই মরেছে!
গ্লুঁক!
ফটাস্
এঃ, কর্কটা কোথায় গিয়ে সেঁধুলো কে জানে
টাকরায় চলে গেলে এতক্ষণে কেত্তিয়ে যেতেন, মনে হয় পেটে চলে গেছে।
গ্লাং!
যাক বাঁচা গেল! মুখেই ধরে ফেলেছেন। ছিপিটা।
রাসকেল পাজি ছুঁচো জানোয়ার ঘরের মধ্যে বোম্বাবাজী! আর একটু হলেই এই স্প্লিনটারটা আমার আলটাকরা ফুটো করে দিচ্ছিল!
ওটা স্প্লিনটার নয় জেঠু, ছিপি।
কি মিথ্যে কথা বলে! এতক্ষণ কর্ক দিয়ে হচ্ছিল, এখন ছিপি কোত্থেকে এলো!
এ ছিপি তোর মুখে ছুঁসে দেব বাঁদর! ঘরের মধ্যে এ উৎপাত আমি একদম বরদাস্ত করবো না।
চলে আয় খুদে। তোর জেঠু ক্রমশই যেন খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠছেন!
হ্যাঁ, তাই তো দেখছি! তুই যদি আগেই আমাকে সতর্ক করে দিতিস তো এমনটা ঘটতো না।

বিজ্ঞানের খবর

অমিত চক্রবর্তী

রোগ চিকিৎসায় লেসার

গোটা দুনিয়ায় রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে **আমূল** সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে। যে গতিতে এই পরিবর্তন ঘটছে তা এক কথায় অবিশ্বাস্য! আমাদের চেনা দুরারোগ্য অসুখগুলো সারাতে এখন আর আগের মতো সময় লাগছে না। চিকিৎসার ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের পেছনে লেসার রশ্মি অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছে।

ইতিমধ্যেই 'মায়োকার্ডিয়াল টনফার্কশন' জাতীয় হৃদরোগ নিরাময়ে লেসার রশ্মি ব্যবহার করে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা দারুণভাবে সফল হয়েছেন। জনৈক সোভিয়েত চিকিৎসক এ ধরনের 49 জন রোগীর ওপর লেসার রশ্মি প্রয়োগ করে তাঁদের সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলেছেন। এই রশ্মি ব্যবহারের ফলে চট্‌পট্‌ তাঁদের হৃদযন্ত্রের চলার গতিতে স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে এসেছে। সোভিয়েত আকাদেমী অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর অধিকর্তা নোডার কিপ্‌সিজ (Nodar Kipshidze)-এর মতে—লেসার রশ্মি ব্যবহারের পদ্ধতিটি খুবই সহজ এবং নানাধরনের হৃদরোগ চিকিৎসাকেন্দ্রে এর প্রয়োগ অনায়াসেই চালু হতে পারে।

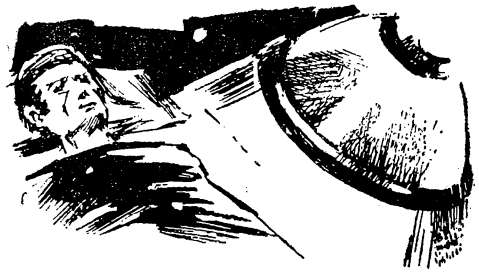

শুধুমাত্র হৃদরোগই নয়, নানাধরনের পুরনো রোগ সারাতেও লেসার রশ্মির ব্যবহার চলছে। যেমন ধরা যাক্—পাকস্থলীর পুরনো ঘা; বহু ওষুধ খাইয়েও যেখানে রোগের কোনও হেরফের ঘটানো সম্ভব হয়নি—সেখানে ক্ষতস্থানে প্রতিবারে তিন মিনিট করে বার কয়েক লেসার রশ্মি প্রয়োগ করে চমৎকার ফল পাওয়া গেছে। দেখা গেছে—লেসার রশ্মি প্রয়োগের পর ক্ষতস্থান দ্রুত সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং ঘা শুকোতে শুরু করছে। পুরনো আন্ত্রিক ঘায়ে মাত্র পাঁচ-ছ' সেকেণ্ডের জন্য লেসার রশ্মি প্রয়োগ করে সেই ঘা-এর সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব হয়েছে। সব থেকে আশার কথা—লেসার রশ্মি ব্যবহারের পদ্ধতিটি এতই নির্ঝঞ্ঝাট যে সাধারণভাবে হাসপাতালের আউট ডোরেই এর সাহায্যে চিকিৎসা সম্ভব।

মানবদেহের চুম্বকত্ব!

বিশেষ কিছু জীবজন্তু, পোকামাকড় এবং পাখিদের দেহে চুম্বকত্বের কথা কিছু কিছু জানা থাকলেও, মানুষের শরীর থেকেও যে চৌম্বক-তরঙ্গ বেরিয়ে আসে—সে খবর নতুন বৈকি! সম্প্রতি জার্মানীর নুরেমবার্গে আরলানজেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়বিক রোগের হাসপাতাল থেকে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা গেছে—মানুষের মস্তিষ্কের ধূসর কোষগুলি থেকেও নাকি প্রতিনিয়ত তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণ বেরিয়ে আসছে। অবশ্য এই তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের জোর পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের তুলনায় কয়েক লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র; বিশেষ ধরনের অতিপরিবাহী ইনডাকশন কয়েল ছাড়া এর অস্তিত্ব টের পাওয়াই অসম্ভব। মস্তিষ্কের এই তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রকে রোগ নির্ণয়ের কাজে লাগানো যায় কিনা—এ নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চালাচ্ছেন আরলানজেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জারগেনভিস্ এবং তাঁর সহযোগীরা। মস্তিষ্কের টিউমার এবং অন্যান্য স্নায়বিক রোগ নির্ণয়ে যে ইলেকট্রো-এন্‌সেফেলোগ্রাম (Electro-Encephalogram) বা ই. ই. জি. এখন ব্যবহার করা হয়—এর পরিবর্তে ম্যাগনেটো-এন্‌সেফেলোগ্রাম ব্যবহার করছেন ওঁরা। দেখা গেছে—এই পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের টিউমার বা মৃগী-জনিত 'ফিটে'র স্নায়বিক উৎস কেন্দ্র খুঁজে বের করতে এটি যথেষ্ট কার্যকরী। প্রচলিত ই-ই-জি'র তুলনায় ম্যাগনেটো-এনসেফেলোগ্রাম-এর কিছু বাড়তি সুবিধেও আছে—যেমন চোখ খোলা বা বন্ধের সঙ্গে এর কাজকর্মের কোনও সম্পর্ক নেই; তাছাড়া শুধুমাত্র মস্তিষ্কের উপরিভাগ অর্থাৎ কর্টেক্স ছাড়াও—মগজের আরও গভীরে যে সব অংশ রয়েছে—তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কেও একটা ধারণা পাওয়া যায় এ পদ্ধতিতে।

চাঁদের জন্মরহস্য

কেমন করে চাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। এ বিষয়ে আর একটু নতুন ব্যাখ্যা মিলেছে হালে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী রিচার্ড ডুরিসেনের মতে—জন্মলগ্নে পৃথিবী কোনও শক্ত বস্তু দিয়ে তৈরি ছিল না। অস্থির পৃথিবীর শরীরটা ছিল তুলতুলে নরম আর বাষ্পময়। অনবরত নিজের কক্ষের চারপাশে ঘোরার জন্য পৃথিবীর চারদিকে বস্তুকণায় একটা ঘন বলয় তৈরি হয়েছিল।

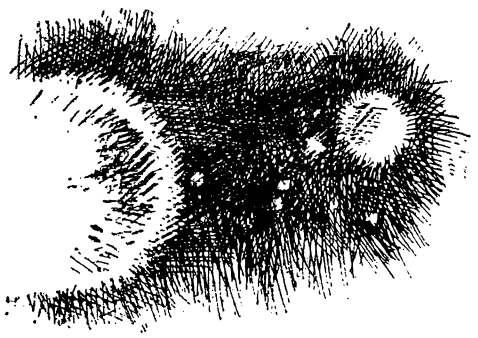

কালক্রমে এই বলয়টি ছিটকে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে শুরু করে। এতে করে বলয়টির অনেকটা অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও—অবশিষ্টাংশ থেকেই নাকি আমাদের আদি-অকৃত্রিম উপগ্রহ চাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল।

ভারতে নতুন বেতার টেলিস্কোপ

কাশ্মীরের গুলমার্গে সম্প্রতি একটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন গামা-রশ্মি টেলিস্কোপ বসানো হয়েছে। এটি বসিয়েছেন ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের অধীনস্থ 'নিউক্লিয়ার রিসার্চ ল্যাবরেটরী' নামে শ্রীনগরের একটি সংস্থা। আকাশের জ্যোতিষ্কদের আরও নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করাই এর উদ্দেশ্য। যেসব জ্যোতিষ্ক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উচ্চশক্তি-সম্পন্ন গামা-রশ্মি এসে পৃথিবীতে পৌঁছায়— তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই নতুন টেলিস্কোপটি অসামান্য ভূমিকা নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। এযাবৎকালের পর্যবেক্ষণে অবশ্য, cygnus x-3 নামে যুগ্ম তারা এবং Crab Pulser কেই উচ্চশক্তিসম্পন্ন গামা-রশ্মি বিকিরণ করতে দেখা গেছে। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা আশা করছেন—গুলমার্গের এই নতুন বেতার টেলিস্কোপটির সাহায্যে এজাতীয় আরও জ্যোতিষ্কের সন্ধান মিলবে।

বীরগাস: দানব কাঁকড়া

চন্দন কুমার নাগ

তোমরা প্রায় প্রত্যেকেই কাঁকড়া দেখেছ। তোমাদের কেউ কেউ কাঁকড়ার মাংস খেয়েছও। সমুদ্র-কাঁকড়া খেতে যেমন সুস্বাদু, দেখতেও বিরাট হয়। তোমাদের আজ যে কাঁকড়ার গল্প শোনাব সেগুলো দেড়-দু'ফুট লম্বা হয়। সবচেয়ে মজার কথা এই কাঁকড়াগুলো এতই বুদ্ধিমান যে সোজা নারকেল গাছ বেয়ে উপরে উঠে যায়, শেষ পর্যন্ত নারকেলের ছোবড়া ছাড়িয়ে খোসা ফাটিয়ে শাঁস ও জল খেয়ে নেয়। এদের সাঁড়াশীর মত পা-দুটোয় প্রচণ্ড জোর। একবার এক শিকারীর দুটো আঙুল কেটে নিয়েছিল ঐ শক্ত দাঁড়া দুটো দিয়ে।

পূর্ণিমার রাত্রে চুপচাপ এক নারকেল বাগানে বসে রইল্যাম। কারণ রাত্রেই এরা শিকারে বেরোয়। সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর লক্ষ্য পড়ল এক নারকেল গাছ বেয়ে উঠে চলেছে একটি কাঁকড়া, এর গায়ের রঙ চকচকে নীল। কখনও কখনও লাল রঙের কাঁকড়াও দেখা যায়। এই ধরনের কাঁকড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও তেমন একটা চোখে পড়ে না। এর বৃহৎ আকারের জন্য ওখানকার লোকেরা একে 'দানব কাঁকড়া' বলে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু এর নাম দিয়েছেন 'বীরগাস'। (প্রথম কলমের নিচে দেখ)

এদের মাংস খুব সুস্বাদু। শক্ত খোলাটা বাদ দিয়ে বাকীটা রান্না করলে গলদা চিংড়ি ছাড়া অন্য কিছুই মনে হয় না। এদের পেটের তলায় একধরনের তৈলাক্ত পদার্থ পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা এই বস্তুটি কাঁচা খেলে নাকি অফুরন্ত যৌবনশক্তি লাভ করা যায়। ম্যালেরিয়া ও হাঁপানির রোগীরা দানব কাঁকড়ার মাংস খেয়ে আরোগ্য লাভ করেছেন। তোমরা যদি কোনদিন আন্দামান বেড়াতে যাও সেখানে এই ধরনের অনেক আশ্চর্য জীব নিজের চোখে দেখতে পাবে। সেদিন খুব মজা হবে তাই না?

কোশলজ্যা, খড়্গপুর।

বিজ্ঞান-সংবাদ

বনমহোৎসব

5ই জুন "বিশ্ব পরিবেশ দিবস" হলেও গোটা জুন মাসটাই আজকাল বিশ্ব পরিবেশ মাস হিসাবে পালিত হচ্ছে। বীরভূম জেলার বোলপুরের সমীপবর্তী গ্রাম ছোট শিমুলিয়ায় এবং বাহিনী-পাঁচ শোয়া অঞ্চলে টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভলপমেন্ট, বাহিনী পাঁচ শোয়া বনমহোৎসব কমিটি এবং "ওয়েলথ ইন্ ওয়েসট্" সংস্থার সহযোগিতায় অনেকগুলি কাজ করলেন এবার।

28শে জুন শনিবার 1986 সকাল ৬টা থেকে বোলপুর শ্রীনিকেতন পঞ্চায়েত সমিতি এবং টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভলপমেন্টের উদ্যোগে পাঁচ শোয়া-ছোট শিমুলিয়া রাস্তার সংযোগস্থল থেকে ইটিণ্ডা পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে বিশ হাজার গাছ লাগানো হয়। এই অনুষ্ঠানে বীরভূমের জেলা শাসক শ্রী শুভেন্দু রায়, অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রী হিরন্ময় চক্রবর্তী, চিফ ইঞ্জিনীয়ার (নগর উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রশাসক বিভাগ) শ্রীশিশির নিয়োগী, প্রধান শিক্ষক পাঁচশোয়া রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ শ্রী অমল সিংহরায় এবং প্রখ্যাত সমাজসেবী ও নিরলস কর্মী শ্রী পান্নালাল দাশগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন।

জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা

17ই আগস্ট, বেলঘরিয়ার প্যারীমোহন লাইব্রেরীতে 'জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা' শীর্ষক একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন বৃহস্পতির বৈঠক ও দি সায়েন্স এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল।

পোজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমী সেণ্টার-এর ডাইরেক্টর ডঃ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতির্বিদ্যা ও হ্যালির অবদান নিয়ে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে স্লাইড দেখানো হয়। দি সায়েন্স এসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের সম্পাদক শ্রী শুভব্রত রায় চৌধুরী এই সব খবরের সঙ্গে আরো জানিয়েছেন যে, গত 22—23 আগস্ট সমিতির উদ্যোগে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে মহিলাদের জন্য "বায়োগ্যাস ও পরিচালনা" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ শিবিরেরও আয়োজন করেছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মজয়ন্তীতে অনুষ্ঠান

সন্ধানী বিজ্ঞান চক্রের উদ্যোগে গত 2রা আগস্ট '86 বানারহাট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 125তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও বিজ্ঞান দিবসের তাৎপর্য'। আলোচনা চক্রের পর বিদ্যালয় স্তরের ছাত্র-ছাত্রীগণ ক্যুইজ প্র তিযোগিতা ও তাৎক্ষণিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটে অবস্থিত সন্ধানী বিজ্ঞানচক্রের তরফে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প প্রতিযোগিতা

ইণ্টারন্যাশন্যাল চিলড্রেন্স ক্লাব সম্প্রতি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর বিভাগে গল্প রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করে বেহালা আর্য বিদ্যামন্দিরের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান জয়ন্ত রুদ্র। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অন্য একটি বিভাগে যথাক্রমে সফল প্রতিযোগীরা হল ঃ দেবেন দাস, মৃণাল কান্তি কুণ্ডু, কৌশিক রায়, সোমনাথ দাস ও শুভব্রত ঘোষ। সংস্থার সম্পাদক এসব তথ্য জানিয়েছেন।

নিখিলবঙ্গ রচনা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল সায়েন্স সোসাইটীর উদ্যোগে সারা পশ্চিমবঙ্গে রচনা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে। বয়স অনুসারে তিনটি বিভাগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিচারকমণ্ডলীতে থাকবেন বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখকগণ। সকল প্রতিযোগীদের নাম কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে বলে সংস্থার তরফে জানিয়েছেন শ্রী পার্থসারথি রুদ্র।

অল বগুলা চাইল্ড সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মানসিক বুদ্ধি ও বিজ্ঞান সচেতন করে গড়ে তোলার জন্য বাঙলার বিজ্ঞানমনস্ক জনসাধারণ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় সম্প্রতি All Bagula Child Science Association গঠিত হয়েছে। বিজ্ঞান আলোচনা, বিজ্ঞানের ছড়া, কবিতা ও রচনা পাঠেরও আলোচনা করবে বলে সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এসব তথ্য জানিয়েছেন বগুলা থেকে অমলেশ বালা। সংস্থার সদস্য হবার নিয়মাবলীতে বলা হয়েছে ঃ বয়স ১১ বৎসর। আবেদন পত্রে বয়স, নাম ও বিদ্যালয়ের নাম-ঠিকানা জানাতে হবে। আবেদন করতে হবে ঃ—অমলেশ বালা, অল বগুলা চাইল্ড এসোসিয়েশন, বগুলা, নদীয়া। পিন 741502।

বিজ্ঞান আলোচনা ও ক্যুইজ কনটেস্ট

রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের এ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি বিভাগে সম্প্রতি ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিলেন অ্যাসেমব্লি অব সায়েন্স লাভার্স এসোসিয়েশন। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডঃ বি. এস. চক্রবর্তী ও ডঃ রমা চৌধুরী। টাকী, হিন্দু, বেথুন, হলি চাইল্ড প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্র

[পরের পাতায়]

প্রথম হাওড়ার পুলের গল্প শুনলে তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হবে। সেকালের হাওড়ার পুলের চেহারাটা কিন্তু আজকের মতো এমন ইস্পাতের তৈরি দানবীয় ছিল না। সেটা ছিল কাঠের তৈরি। অনেকটা বুড়ো মানুষের নড়বড়ে দাঁতের মতো। গাড়ি-ঘোড়া চললেই খটখট করে নড়তো। সেটা কিভাবে তৈরি হয়েছিল বলি। কতগুলো লোহার নৌকো গঙ্গার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত আড়াআড়িভাবে সাজানো থাকতো। সেগুলো গঙ্গা নদীর জলের ওপর ভাসতো ঠিক 'বোয়া'র মতো। তার ওপর লম্বা লম্বা কাঠ বিছিয়ে বানানো হয়েছিল এই কাঠের পুল। লোকে বলতো ভাসমান সেতু। গাড়ি, ঘোড়া, মানুষ সবই এর ওপর দিয়ে যাতায়াত করতো।

এই কাঠের পুলের একটা মজার ব্যাপার ছিল, বড়ো বড়ো নৌকা, জাহাজ, স্টিমার ইত্যাদি যাতায়াতের জন্য এর মধ্যিখানটা খুলে দেওয়া হতো। তবে সব সময় এটা খোলা হতো না। খোলা হতো সাধারণত রাত্রিবেলায়। গঙ্গায় কখন জোয়ার আসবে, বা কখন ঝড় উঠবে এবং সেই ঝড়ে নদী ও সাগরের জল কতটা উত্তাল হবে—আজকাল রিভার ট্রাফিক পুলিশ যেমন রেডিও বা খবরের কাগজ মাধ্যমে মাঝি-মাল্লাদের জানিয়ে দেয় সেকালেও এরকম ব্যবস্থা ছিল। হাওড়ার পুল কখন খোলা হবে, কতক্ষণ খোলা থাকবে তার বিজ্ঞাপন আগেই খবরের কাগজে দিয়ে দেওয়া হতো।

এবার বলি, কলকাতার গঙ্গার ওপর এই প্রথম কাঠের তৈরি পুলটি কে নির্মাণ করেছিলেন। জাতে তিনি একজন বিদেশী। ভদ্রলোকের নাম স্যার ব্র্যাডফোর্ড লেসলি। সেকালে আউধ ও রোহিলখণ্ডের প্রধান ইঞ্জিনিয়র ছিলেন ইনি। এই পুলটি তৈরি করার জন্য যা টাকা খরচ হয়েছিল তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছিলেন তৎকালীন 'কলকাতা পোর্ট কমিশন' কর্তৃপক্ষ। পুলটির নির্মাণকার্য শেষ হতে সময় লেগেছিল প্রায় এক বছর। এটির নির্মাণকার্য শেষ হলে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল 1874 সালে 17ই অক্টোবর। এরপর বর্তমান (ইস্পাতের তৈরি) হাওড়ার পুল নির্মাণ হলে 1945 (ইং) সালে এই কাঠের পুলটি ভেঙে ফেলা হয়।

ইস্পাতের তৈরি বর্তমান হাওড়ার পুলের নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল ইংরাজী 1937 সালে, এবং এটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল 1943 সালে। এটি তৈরি হয়েছিল প্রথম (কাঠের তৈরি) পুলের কিছুটা উত্তরে।

প্রসঙ্গত বলি, বর্তমান ইস্পাতের তৈরি বা দানবীয় হাওড়ার পুলটি তোমরা দেখছ। এটি (কলিকাতার কাছাকাছি) গঙ্গা নদীর ওপর চতুর্থ পুল। প্রথম পুলের কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় পুলটির নাম 'জুবিলি পুল'। জুবিলি পুল নাম কেন হলো? মহারানী ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণ জয়ন্তী (জুবিলি) উপলক্ষে ইংরাজী 15-3-1887 তারিখে এটি তৈরি হয়েছিল। এই দ্বিতীয় পুলটি ব্যাণ্ডেল ও নৈহাটির মধ্যে সংযোগ রচনা করে চলেছে।

আর তৃতীয় পুলটি বালি ও দক্ষিণেশ্বর গঙ্গার ওপর অবস্থিত। এটির নাম 'উইলিংডন পুল' (বর্তমান নাম 'বিবেকানন্দ সেতু')। বড়লাট উইলিংডন-এর আমলে এটি তৈরি হয়েছিল। এর নির্মাণকাজ আরম্ভ হয়েছিল 1927 সালে আর শেষ হয়েছিল 1931 সালে।

A—22/14, Santragachi Rly. colony
P O.—Jagacha
Dist—Howrah,

ছাত্রীরা ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আলোচনা-চক্রে 'মানব দেহে হরমোনের উপযোগিতা' বিষয়ে ভাষণ দেন ডঃ কে. কে. ঘোষ। এ্যাসেমব্লি অব সায়েন্স লাভার্স এসোসিয়েশনের পক্ষে এ খবর জানিয়েছেন শ্রীদেবব্রত লাহা।

রবীন্দ্র জীবনে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

রবীন্দ্রনাথের 125তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 16 আগস্ট বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সভাকক্ষে কিশোর কল্যাণ পরিষদ বিজ্ঞান বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনার বিষয় ছিল 'রবীন্দ্র জীবনে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী।' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডঃ ধীরেন্দ্র বিজয় বিশ্বাস এবং সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন,' 'রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য জগদীশচন্দ্র' 'রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য সত্যেন বসু' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন যথাক্রমে অধ্যাপক মৃণালকুমার দাশগুপ্ত, দিবাকর সেন, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতি ডঃ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চিন্তা বিশ্লেষণ করেন। সভায় পরিষদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ডঃ হেমেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ অশেষ খান ও ডঃ বিমলেন্দু মিত্র এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করে পরিষদের তরুণ সভ্য-সভ্যারা।

ভোর হল। আড়মোড়া ভেঙে সবে উঠে বসেছি, এমন সময়ে আচমকা আতঙ্কে যেন উন্মাদ হয়ে গেল বিচিত্র প্রাণীদের পুরো দলটা।

সেকী হট্টোগোল! কানের পোকা বেরিয়ে গেল যেন অকস্মাৎ! বাসা ছেড়ে টপাটপ লাফিয়ে পড়ছে সকলেই। দিশেহারা হয়ে ছুটছে যে যেদিকে পারে।

হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম আমি। দেখি, আর্থার আর প্রফেসরও চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে দাঁড়িয়েছে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে এদিকে সেদিকে।

হঠাৎ বনের ভেতর থেকে হাওয়ায় ভেসে এল একটা অদ্ভুত শব্দ। পেছন দিকে পুরো বন ঘিরে যেন দামামা কাড়া-নাকাড়া-টিন-ক্যানেস্তারা বাজছে একসঙ্গে। অনেক দূরে। বাতাস বয়ে আনছে ক্ষীণ শব্দটাকে। এই শব্দ শুনেই নিঃসীম আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেছে এরা।

পৃথিবীর জঙ্গলে এমনি আওয়াজ শোনা যেত একসময়ে। শিকারীরা যখন শিকার করতে বেরত, তখন জানোয়ারদের ভয় পাইয়ে একদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে টিন ক্যানেস্তারা পেটানো হত। একদিকের জঙ্গল ঘিরে পিটতে পিটতে এগিয়ে আসত জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। ভয়ার্ত পশুর দল ছুটত এক দিকেই—যেদিকে শব্দ নেই—কিন্তু বন্দুক নিয়ে ওৎ পেতে আছে শিকারীরা।

সোরোর গ্রহেও শিকার পর্ব শুরু হল নাকি? আওয়াজটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে বনের তিনদিক ঘিরে—পেছনের দিক দিয়ে। দিশেহারা প্রাণীদের মধ্যে যাদের বয়স হয়েছে, হঠাৎ তারা বিদঘুটেভাবে চেঁচিয়ে আঙুল তুলে দেখালে সেইদিকেই—যেদিকে নেই কোনো শব্দ। পুরো দলটা পাঁড়ি কি মরি করে ছুটল সেইদিকে। বাচ্চাকাচ্চা সমেত। নোভাকে দেখলাম চোখ বড় বড় করে দৌড়াচ্ছে সেইদিকেই। আতঙ্ক যেন পেয়ে বসল আমাকেও। বনের ভেতর থেকে কী বিভীষিকা এগিয়ে আসছে জানি না—পরিত্রাণের পথ কোথায়, তাও জানি না। কিন্তু সবাই যেদিকে ছুটছে, ছোটা যাক সেইদিকেই।

তীরবেগে তাই ধেয়ে গেছিলাম ওদের পেছন পেছন। আর্থার আর প্রফেসরের কথা একদম ভাবিনি। এখন অবশ্য তা ভাবলে লজ্জা পাই। ভয় এমন জিনিস। কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়। হাঁপাতে হাঁপাতে যখন ওদের নাগাল ধরে ফেলেছি, আর্থারকে দেখলাম আমার ঠিক পেছন পেছন ছুটে আসছে। প্রফেসরকে দেখতে পেলাম না। বুড়ো মানুষ। পড়ে রয়েছেন পেছনে। ফিরে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারিনি।

দৌড়! দৌড়! দৌড়! জঙ্গল ভেঙে দুদ্দাড় করে নক্ষত্রবেগে ছুটে যাচ্ছে পুরো দলটা। পেছনে এগিয়ে আসছে সেই বিচিত্র ভয়াবহ শব্দলহরী। সমস্ত বনানী যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে হট্টগোল, অট্টরোল আর টিনপেটার আওয়াজে।

তারপরেই রক্ত হিম হয়ে গেল আমার নতুন একটা শব্দ শুনে। শব্দটা শুনলাম সেইদিক থেকে যেদিকে ছুটছি ঊর্ধ্বশ্বাসে।

বন্দুকের শব্দ!

না। কোনো সন্দেহই নেই। বন্দুকনির্ঘোষই বটে। কখনো একবার। কখনো উপর্যুপরি দুবার। ঠিক যেন দোনলা বন্দুকের পর-পর ধমক!

থ-হয়ে গিয়েও দাঁড়াতে পারিনি। বন বন করে যেন ঘুরছে পা—পদযুগলকে থামাতে পারিনি। কী বিস্ময় কী বিভীষিকা ওৎ পেতে রয়েছে সামনে, তা জানি না। বোধ হয় জানার আগ্রহেই আরো বেশি করে ছুটে গেছিলাম সামনের দিকেই—ফায়ারিংয়ের শব্দ লক্ষ্য করে। আর্থার ছুটছে আমার সঙ্গে।

একই সঙ্গে দুজনে বেরিয়ে এলাম পাতলা জঙ্গলে।

সামনে একটা টিলা। হামাগুড়ি দিয়ে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে রেখে সন্তর্পণে উঠলাম টিলার ওপর।

তারপর যে দৃশ্য দেখলাম, তা আমার কল্পনার বাইরে! মাথায় হঠাৎ দুরমুশ পড়লেও বুঝি এতটা স্থানু হয়ে যেতাম না!

বেখাপ্পা অনেক কিছুই চোখে পড়েছিল সেই মুহূর্তে—আতঙ্কে অবশ হয়ে গেছিল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। কিন্তু যাকে দেখে সবচেয়ে বেশি শিউরে উঠেছিলাল, সে দু-পা ফাঁক করে নিস্পন্দদেহে দাঁড়িয়েছিল মাত্র তিরিশ হাত দূরে নজর আমি যেখানে লুকিয়ে, সেইদিকেই।

বিষম বিস্ময়ে চেঁচিয়ে যে উঠিনি, এই যথেষ্ট। আতঙ্ক আর বিস্ময়বোধ—দুটোই কেড়ে নিয়েছিল আমার বুদ্ধিশুদ্ধি। আতঙ্ক তো হবেই। পেছন থেকে বিকট চেঁচাতে চেঁচাতে টিন পেটাতে পেটাতে যারা আসছে, তারা এসে গেল বলে, এদিকে সামনেই খাড়া বিচিত্র এই প্রাণী—মৃগয়ানন্দে মত্ত। শিকার করার উত্তেজনা সত্ত্বেও স্থির, নিষ্কম্প।

বিচিত্র প্রাণী যাকে বললাম, এককথায় তাকে গরিলা বলা যায়। হ্যাঁ, গরিলাই বটে। কিন্তু নিছক গরিলা দর্শনের জন্য শিহরিত হইনি। হয়েছিলাম সোরোর গ্রহের এই গরিলার জামাকাপড় দেখে।

পরনে পরিপাটি বেশ। সভ্য মানুষের পোশাক। জামা-কাপড় পরায় যে রীতিমত অভ্যস্ত, এই জিনিসটা লক্ষ্য করেই মাথা ঘুরে গেছিল আমার। মানুষের পোশাক বাঁদরে পরে আমরা জানি, কিন্তু এমন নিখুঁতভাবে পরে না, পরবার পর এমন সহজভাবে থাকে না। ছদ্মবেশে নয়। স্বাভাবিক বেশে। নোভা আর তার দলবল জামাকাপড় না পরে যেমন স্বাভাবিক, আশ্চর্য এই গরিলা জামাকাপড় পরে তেমনি স্বাভাবিক।

মৃগয়াপর্বে যারা যায়, ঠিক তাদের মতই জামাকাপড় গায়ে চাপিয়েছে গরিলাটা। গাঢ় বাদামী রঙের কোটটা যেন প্যারিসের সেরা দর্জির হাতে তৈরি। কোটের নিচেই দেখা যাচ্ছে চেককাটা শার্ট—পৃথিবীর স্পোর্টসম্যানরা যেমন পরে। ব্রীচেজ নেমে আসছে পায়ের ডিম পর্যন্ত—তারপরে শুরু হয়েছে বড় সাইজের ক্যালো রঙের গ্লাভ বা দস্তানা। বুট নেই। মানুষ শিকারীর পায়ে বুট থাকে—এর পায়ে বুট নেই।

গরিলাই বটে! শার্টের কলারের ফাঁক দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে কদাকার মুণ্ড, ওপর দিকে মিছরির চাকের মত ছুঁচোলো। কুচকুচে কালো চুলে ঢাকা। নাক চ্যাপ্টা। ঠেলে বেরিয়ে আসছে চোয়াল। সামান্য ঝুঁকে রয়েছে নির্নিমেষে, ঠিক সেই দিকেই ঘাপটি মেরে রইছি আমি।

আচমকা শক্ত হয়ে গেল তার দেহ। কানে গেছে শব্দটা। শুনেছি আমিও। আমার ডানদিকের ঝোপ থেকে ভেসে এসেছে ক্ষীণ শব্দ। ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাঁধে রাইফেলের কুঁদো লাগিয়ে টিপ করে নিলে গরিলা-শিকারী। ঘাড় ফিরিয়ে ঘাসের মধ্যে দিয়ে দেখলাম, পলাতকদের একজন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে অন্ধের মত ধেয়ে যাচ্ছে সামনে। চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সময় পেলাম না। পাহাড়ি ছাগলের মত তেড়েমেড়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে গেছে প্রায় নগ্ন লোকটা। রাইফেল গর্জে উঠল তক্ষুনি। শূন্যে ছিটকে গেল পলাতকের দেহ, আছড়ে পড়ল মাটিতে। স্থির হয়ে গেল বার কয়েক মরণ মোচড়ানির পর।

যে মারা গেল, আমার চোখ তখন সেদিকে নেই। গুলি যে চালাল, বিহ্বলচোখে তাকিয়েছিলাম তার দিকে। ঝোপের মধ্যে ক্ষীণ শব্দটা শোনার পর থেকেই গুলি চালানো পর্যন্ত পর পর অনেকগুলো বিস্ময় সৃষ্টি করে গেছিল মনের মধ্যে। প্রথম, নিষ্ঠুর চাহনি আর উল্লাস—শিকার বধ করার পর এমন চাহনি আর উল্লাস দেখা যায় শিকারীর চোখেমুখে। দ্বিতীয়, তার চোখের স্ফুলিঙ্গ—যা কেবল দেখা যায় মানুষের চোখেই। বোধশক্তি আছে। যা আমি বৃথাই খুঁজেছি সোরোর গ্রহের মানুষদের চোখে।

এবার আমার পালা। ভাবতেই কেটে গেল স্তম্ভিত ভাবটা। গুলির আওয়াজেই ঘোর কেটে গেছিল। আছড়ে পড়া লোকটার মৃত্যুযন্ত্রণা লক্ষ্য করছিলাম বিস্ফারিত চোখে। তারপরেই রক্ত হিম হয়ে গেল এমনি আরও লাশ দেখে। জঙ্গলের কিনারা ভরে গেছে গুলিবিদ্ধ লাশে। সবই মানুষের দেহ। মানুষ শিকার চলছে ঢালাওভাবে। আর একজন গরিলাকে দেখলাম একশ হাত দূরে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে। দূরে দূরে সমান ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আরও কয়েকজন। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। গরিলারা গুলি চালাচ্ছে মানুষের ওপর—মানুষ শিকার করছে নিষ্ঠুরভাবে—সেই দৃশ্য দেখতে হচ্ছে আমাকে!

অসহ্য এই বিভীষিকা দেখা যায় না। চোখ সরিয়ে নিলাম। এর চাইতে কিম্ভূতকিমাকার দৃশ্য দেখা অনেক ভাল। তাই তাকালাম সামনের গরিলাটার দিকে। এক পা পাশে সরে দাঁড়িয়েছে সে। পেছনেই দাঁড়িয়েছিল একটা শিম্পাঞ্জী। শিকারী গরিলা এইমাত্র তার হাতে তুলে দিয়েছে রাইফেল। গুলিভর্তি আর একটা রাইফেল প্রভুর হাতে তুলে দিচ্ছে ছোকরা শিম্পাঞ্জী। পরক্ষণেই, নিপুণ হাতে কোমরে বাঁধা বেল্টের খোপ থেকে কার্তুজ তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল শূন্য রাইফেলে। বেটেলগুজ সূর্যের কিরণ ঠিকরে গেল রাইফেলের চকচকে গা থেকে। আবার দুই ক্ষুদে দানব দাঁড়িয়ে গেল যে যার জায়গায়।

সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলো নিয়ে তলিয়ে ভাববার সময় পেলাম না। আর্থার এলিয়ে রয়েছে আমার পাশেই। নিদারুণ আতঙ্কে হাত-পা নাড়বারও ক্ষমতা নেই। সুতরাং ওর দিক

থেকে সাহায্য পাব না। বিপদ এদিকে বেড়েই চলেছে মুহূর্তে মুহূর্তে। টিন পেটাতে পেটাতে কালান্তক শিকারীদের সাঙাৎরা এগিয়ে আসছে পেছন দিক থেকে। কানের পর্দা যেন ফেটে যাচ্ছে ভীষণ আওয়াজে। সত্যিই যেন ঘেরাও পশু আমরা। পালাবার পথ এখনও আছে। কিন্তু ভয়ে দিশেহারা সকলেই। জঙ্গল থেকে এত মানুষ বেরিয়ে আসবে ভাবতেও পারি নি। কাতারে কাতারে ছুটছে ক্ষিপ্তের মত, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে, লুটিয়ে পড়ছে।

ভয়ে উন্মাদ সবাই অবশ্য নয়। টিলার মাথা থেকে দেখলাম, এদেরই মধ্যে জনা কয়েক, যাদের বয়স হয়েছে এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। চার হাত পায়ে গুড়ি মেরে বসে রয়েছে নিঃশব্দে ঘাসের আড়ালে। বন্দুকধারীদের নজর অন্যদিকে ঘুরে গেলেই কক্ষচ্যুত উল্কার মত মৃত্যু-প্রান্তর পেরিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে পেছনকার জঙ্গলে।

ঠিক করলাম, পালাতে হবে এই ভাবেই। আর্থারকে বললাম,

কি করতে হবে। গুটি গুটি এগিয়ে গেলাম ঘাসবনের কিনারায়।

এই সময়ে পেছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটা গরিলা। মানুষদের যারা তাড়িয়ে আনছে, তাদেরই একজন তবে টিন পেটাচ্ছে না। ভয়াবহ হুঙ্কার ছাড়ছে। আর হাতের গদা দিয়ে এলোপাতাড়ি মারছে মানুষদের। ভয়ঙ্কর সেই মূর্তি আর ভয়াবহ প্রহার প্রচণ্ড আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে পলাতকদের মধ্যে। গদার মার যারা এড়িয়ে যেতে পারছে,

তারা ছুটে যাচ্ছে মাঠের মধ্যে—সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ছে গুলি খেয়ে।

দেখেই ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল আর্থার। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগেছে, বেচারা!

আমার নজর রইল সামনের বন্দুকধারী গরিলাটার দিকে।

ঠিক এই সময়ে ভয়ে পাংশু আর্থার বোকার মত নিজের প্রাণ দিয়ে পথ করে দিলে আমার পালিয়ে যাওয়ার। ভয়ানক ভয়ে সত্যিই ওর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। নইলে আচমকা দাঁড়িয়ে উঠে ধেয়ে যায় মাঠের মধ্যে? একদম গুলিবর্ষণের সামনে। পরিণামটা হল মারাত্মক। দেহটা মনে হল যেন দুটুকরো হয়ে গেল এক ঝাঁক গুলিতে। দড়াম করে প্রাণহীন দেহটা আছড়ে পড়ল মাঠে।

শোকে বিমূঢ় হওয়ার সময় তখন নয়। আর্থার নিধন করেই শূন্য রাইফেলটা যেই শিম্পাঞ্জী সহকারীর হাতে দিয়েছে শিকারী গরিলা, সাঁৎ করে বেরিয়ে এলাম ঘাসের আড়াল থেকে—বিদ্যুৎবেগে পেরিয়ে গেলাম মাঠটা—স্বপ্নের ঘোরে যেন দেখলাম বিস্ময়চকিত চিৎকার করে শিকারী গরিলা তাড়াতাড়ি লোডেড রাইফেল ছিনিয়ে নিল শিম্পাঞ্জী সহকারীর হাত থেকে—ততক্ষণে আমি ঢুকে পড়েছি গভীর জঙ্গলে।

বিস্ময়চকিত চিৎকারটা যেন গালাগাল দেওয়ার মতই মনে হয়েছিল। অদ্ভুত, সন্দেহ নেই। কিন্তু তা নিয়ে তখন ভাববার সময় নেই।

বিষম আনন্দে আমি তখন নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেছি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। দেখতে দেখতে কোলাহল ক্ষীণ হয়ে এল পেছনে।

কিন্তু বাঁচলাম না এত কাণ্ড করেও! সোরোর গ্রহের বাঁদরগুলো যে এত কুটিল, তা তো জানতাম না। শ'খানেক গজ যেতে না যেতেই ঝোপের মধ্যে ঢাকা জালে জড়িয়ে পড়লাম। অনেকগুলি খুপরি রয়েছে জালের মধ্যে। এক-একটা খুপরিতে আটকে রয়েছে এক-একটা মানুষ। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও বেশি জড়িয়ে যাচ্ছে।

কি রকম যেন হয়ে গেলাম আমি। এতক্ষণ বেশ মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলাম। আচমকা ফাঁদে পড়ায় ভয়ে রাগে উত্তেজনায় সব গোলমাল হয়ে গেল মাথার মধ্যে। পাগলের মত আমিও হাত-পা ছুঁড়ে জাল থেকে বেরিয়ে আসতে গেলাম এবং আরও বেশি করে জড়িয়ে গেলাম। শেষকালে এমন এঁটে গেলাম ফাঁদের মধ্যে যে হাত-পা নাড়বার অবস্থাও আর রইল না। শুনতে পেলাম গরিলাও এগিয়ে আসছে আমাদের শেষ করে দিতে।

[আগামী সংখ্যায় ঃ খাঁচায় বন্দী মানুষ]

কিশোর থেকে প্রৌঢ় সব বয়সের
জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার!

কোন ভাসাভাসা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নয়,

১২টি ক্লাসিকসের কিশোরোপযোগী পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ৬০৲ পরিবর্তে ৪৫৲

একখণ্ডে

কিশোর বিশ্ব ক্লাসিকস

৬৫০ পৃষ্ঠা, বড় হরফ, ভাল কাগজ, অফসেটে ছাপা মনোরম লেমুনেটেড প্রচ্ছদ, ডিলুক্স বাঁধাই, সাবলীল অনুবাদ। এতে আছে বেনহুর, ডনকুইকজোট, গ্যালিভার্স ট্রাভেলস আংকল টমস কেবিন, রবিনসন ক্রুসো, টোয়েন্টি থাউজেণ্ড-লীগস আণ্ডার দ্যা সী, ট্রেজার আইল্যাণ্ড, বিদুর পাণ্ডত জাতক, রবিনহুড, রিপভ্যান উইংকল, বেতাল পঞ্চবিংশতি বত্রিশ সিংহাসন, এগুলি পৃথক মূল্য ১৫০৲

প্যারীচাঁদ মিত্রের

আলালের ঘরের দুলাল ১২৲

আঃশুকুরের জীবনের অসমাপ্ত কবিতা ১০৲

শ্রীসুধাংশুরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত

বেতাল পঞ্চবিংশতি ও বত্রিশ সিংহাসন ১৫৲

বেনহুর ১২৲

একখানি বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ সংগ্রহ করুন!

বিশ্বখ্যাত ক্লাসিকস গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

কার্ল মার্কসের

ক্যাপিট্যাল

৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৪ খণ্ড প্রকাশিত ৫ম যন্ত্রস্থ

১ম খণ্ড পুনঃ মুঃ ৪৫৲, ২য় খণ্ড পুনঃ মুঃ ৫৫৲,
৩য় ৩৫৲ ৪র্থ ৪০৲, ৫ম ৬০৲, ৬ষ্ঠ ৬৫৲

বাণী প্রকাশ ॥ এ ১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ৭০০০০৭

প্রফেসর ব্রহ্ম এবং ক্লোরোফিল চোর

সুবীন্দ্র সরকার

'ইম্পসিবল!' প্রোফেসর ব্রজহরণ মণ্ডল ওরফে ব্রহ্ম উত্তেজিত হয়ে টেবিলে একটা ঘুষি মেরে বললেন, "এ সিগন্যাল কিছুতেই চ্যালেঞ্জারের হতে পারে না।" টেবিলের ওপর রাখা দুটো কাঁচের বিকার ছিটকে মেঝেতে পড়ে ঝনঝনিয়ে চুরমার হয়ে গেল। প্রোফেসর ফের চিৎকার করে বললেন, "তুমি আমাকে সিগন্যাল চেনাচ্ছ? ফ্রিকোইন্সির হেরফের হচ্ছে কেন?"

সৌগত বর্মণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মুখগুমরে বসে রইলেন। স্যারকে এরকম রাগতে উনি কোনও দিন দেখেন নি।

প্রোফেসরের চোখ মুখ লাল। বললেন, "তোমার পোর্টেবল সিগন্যাল ডিটেক্টরে নিশ্চয়ই কোনও গোলমাল আছে।"

চেঁচামেচি শুনে হারু ভেতরের ঘর থেকে দৌড়ে এল, "ব্যাপারটা কী? এত হুল্লোড় কিসের?" তারপর মেঝের দিকে তাকিয়ে হাঁ হাঁ করে উঠল, "ইশ! করেছেনটা কী? সদ্য কেনা বিকার দুটো ভেঙ্গে ফেললেন?"

হারুকে দেখে প্রোফেসরের মেজাজের পারদ দপ করে নেমে গেল। পাছে ও রাগ করে তাই বললেন, "একটু সাবধানে পা ফেলিস। কাচের টুকরো লেগে আবার রক্তারক্তি কাণ্ড না ঘটে।"

হারু কোনও জবাব না দিয়ে ঝাঁট দিতে শুরু করল।

সৌগত বর্মণ বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আপনি যদি ডিটেকটরটা একটু দেখে দেন তো খুব ভাল হয়।"

"এখন আমার হাতে সময় নেই।" প্রোফেসর জোরে ঘাড় নাড়লেন।

"সময় নেই মানে?" হারু ধমকালো। ঝাঁট দিতে দিতে বলল, "উনি আপনার ছাত্র। আপনি দেখে দেবেন না তো কে দেবে?"

প্রোফেসর হারুকে চটাতে চান না। কারণ উনি জানেন, হারু না থাকলে ওঁকে বিজ্ঞান সাধনা না করে, হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হত। ও ছিল বলে অন্য কোনও দিকে নজর না দিয়ে সারাদিন ল্যাবরেটরিতে থাকতে পারেন। তাইতো, প্রোফেসরের অ্যাসিস্টেন্ট-কাম-গার্জেন হারু মহান্তির নাম এখন প্রোফেসরের সমস্ত আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত।

সিগন্যাল ডিটেকটরের নব বন্ধ করে সৌগত বর্মণ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"কী হল উঠলে যে?" প্রোফেসর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন।

"এটা তাহলে বাড়ি গিয়ে খোলাখুলি করি।" সৌগত বর্মণ জবাব দিলেন।

"থাক!" প্রোফেসরের গলার স্বর গম্ভীর, "ওটা রেখে দাও। আমি পরে দেখব।"

সৌগত বর্মণের চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠল। হেসে বললেন, "তাহলে তো খুব ভাল হয় স্যার।"

হারু মুখ টিপে হাসতে হাসতে কাচের টুকরোগুলো জড়ো করে বেরিয়ে গেল।

প্রোফেসর বললেন, "তোমার থিসিসের পেপারস্ সব দেখে রেখেছি। টাইপ করে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। মনে হচ্ছে ডক্টরেট পেয়ে যাবে।"

সৌগত বর্মণ মাথা নিচু করলেন, "আপনার কাছে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য স্যার।" পা ছুঁলেন প্রোফেসরের।

"ঠিক আছে! ঠিক আছে!" প্রোফেসর সিগন্যাল ডিটেকটরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবারে বাড়ি যাও। রাত্রে এটা নিয়ে বসব"।

রাত দুটো। এগিয়ে চলল ঘড়ির কাঁটা। প্রোফেসর ব্রহ্ম লেবরেটরিতে সিগন্যাল ডিটেকটর যন্ত্রটা নিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে ছিলেন। হারু ইতিমধ্যে দুবার ওঁকে শোওয়ার জন্য তাড়া দিয়ে গিয়েছে। "এই যাচ্ছি" বলে প্রোফেসর আবার আগের মত নিজের কাজে মন দিয়েছেন।

বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহের সিগন্যাল ঠিক ঠিক ডিটেক্ট করা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু এমন একটা নতুন ধরনের সিগন্যাল যন্ত্রটাতে ধড়া পড়ছে, যেটা প্রোফেসারের কাছে অনাহুতের মত! এবং এই সিগন্যালের শব্দও একটু বিচিত্র রকমের! বেশ জোরালো সিগন্যাল। ডিটেক্টর স্ক্যানারে জিগ্‌জ্যাগ জ্বলন্ত রেখা বিক্ষিপ্তভাবে ছোটাছুটি করছিল! প্রথমে ভেবেছিলেন ডিটেক্টর গোলমাল করছে। কিন্তু, পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখার পর কোনও গড়বড় চোখে পড়ল না।

হঠাৎ সিগন্যাল ক্রমশঃ বাড়তে শুরু করল। একটানা কির কির শব্দে কান মাথা ঝালাপালা হতে লাগল। এত বিশ্রীভাবে তো কোনও সিগন্যাল বাজে না? তবে কী অপার্থিব কোনও সিগন্যাল? ডিটেক্টরে কী তারই সংকেত? কথাটা মনে হতেই প্রোফেসরের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল!

'কির কির' শব্দটা দ্রুত বাড়ছিল। অস্বস্তিতে সিগন্যাল ডিটেক্টরের 'নব' বন্ধ করে টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখলেন। নতুন চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। যদি সত্যি কোনও অপার্থিব বস্তুর সিগন্যাল হয়? তাহলে কী সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে পৃথিবীর বুকে!

প্রোফেসর জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন। বাড়ির পেছনের বাগানে ওঁর হাতে লাগানো গাছগুলো অন্ধকারে হাওয়ায় দুলছিল। কানে এল গাছের পাতায় বাতাসের ফিস্‌ফিসানি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুষ্প্রাপ্য গাছ এনে বাগান করেছেন। যে দেখে সেই তারিফ করে। সরকারী হর্টিকালচারও ম্লান হয়ে গিয়েছিল প্রোফেসরের বাগানের সৌন্দর্য্যের কাছে।

লম্বা একটা শ্বাস টেনে ফিরে এলেন কাজের টেবিলে। ঘড়ির দিকে তাকালেন। পৌনে তিনটে। আর ঘণ্টা তিনেক পরেই সূর্য উঠবে। হাই তুলে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেলেন শোওয়ার ঘরের দিকে।

সকালে চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল প্রফেসরের। কাকভোরে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করেছিল হারু। বাগানে গাছে জল দিতে গিয়ে চোখ ছানাবড়া। প্রোফেসরের এত সাধের বাগান, কে যেন রাতারাতি মুড়িয়ে দিয়েছিল। কোনও গাছেই সবুজের চিহ্নমাত্র ছিল না। প্রত্যেক গাছের পাতাগুলো ভোজবাজির মত উবে গিয়েছিল। বাগানে গাছের জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল, কতকগুলো পত্রহীন ডালপালা। এমন কি বাগানের আনাচে-কানাচে যেখানে সবুজ ঘাস ছিল, সেখানকার মাটি মরুভূমির মত ফ্যাকাসে!

বিছানা ছেড়ে দৌড়ে বাগানে গেলেন প্রোফেসর। বাগানের লোহার বেঞ্চিতে বসে পড়লেন ধপ করে! রাত্রে শুতে যাওয়ার আগেও স্বচক্ষে গাছগুলোকে দেখেছিলেন। হঠাৎ কী এমন ঘটল? যার জন্যে বাগানে একফোঁটাও সবুজ নেই। কোন শক্তি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাগানের মধ্যে বাগানের এতগুলো গাছকে পত্রহীন করে ফেলল? শুকনো হলুদ পাতাগুলো গাচের নিচে পড়েছিল, কিন্তু সবুজ পাতা একটাও নেই! পৃথিবীতে এমন কোনও তৃণ-ভোজী প্রাণী আছে কী, যাঁরা চোখের নিমেষে এতগুলো গাছকে রুক্ষ করে দিতে পারে?

মাথা ঝিমঝিম করে উঠল ওঁর। টলতে টলতে ফিরে এলেন লেবরেটরিতে। কিছুক্ষণ বসে রইলেন চেয়ারে। হারু ওঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল জবুথবু হয়ে। গাছগুলোর অবস্থা কিছুতেই ও মেনে নিতে পারছিল না।

টেবিলের ওপরে রাখা সিগন্যাল ডিটেক্টরে হাত দিলেন প্রোফেসর। বিকেলে সৌগত আসবে। তার মধ্যে ডিটেক্টরের গোলমালটা খুঁজে বের করতেই হবে। ডিটেক্টরের সুইচ 'অন' করলেন উনি। নব ঘুরিয়ে শুনতে গেলেন কাল রাতে শোনা সেই অপরিচিত সংকেত। আশ্চর্য! সিগন্যাল ডিটেক্টরে এখন কোনও গণ্ডগোল নেই। শোনা গেল না সেই অনাহুত সিগন্যাল! ডিটেক্টরের স্ক্যানারও নিয়মমাফিক কাজ করল। কোনও গণ্ডগোলই ধরা পড়ল না।

প্রোফেসর বিস্মিত! এরকম আবার হয় নাকি? ডিটেক্টর নিজে থেকেই ঠিক হয়ে গেল কী করে? মাথার মধ্যে সব কেমন যেন ওলোট পালোট হয়ে গেল। সিগন্যাল ডিটেক্টরের সুইচ অফ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

হারু চা নিয়ে এল। প্রোফেসরকে বসে থাকতে দেখে

সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "ভেবে আর কী করবেন? এমন অলুক্ষণে কাণ্ড আমি জীবনে দেখিনি।"

"হুঁ!" চায়ে চুমুক দিলেন প্রোফেসর। "রাতারাতি গাছের পাতাগুলো চেটেপুটে সাফ করে দিল?"

"কী করবেন ঠিক করলেন?" হারু জিজ্ঞেস করল।

"কিছুই ঠিক করিনি।" প্রোফেসর ভুরু কুঁচকে বললেন, "তবে কাল রাতে সিগন্যাল ডিটেক্টার যে অনাহূত অপরিচিত সিগন্যালটা পেয়েছি, সেটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। মনে হচ্ছে গাছের পাতা উবে যাওয়ার সঙ্গে এর একটা যোগসূত্র আছে!"

হারু কাঁধ ঝাঁকালো, "সে আবার কী?"

"হুঁ। আমি একটু বেরব। ফিরত দেরী দেখলে খেয়ে নিস।" প্রোফেসর বাথরুমের দিকে পা বাড়ালেন।

বিজ্ঞান কলেজের মিঃ মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রোফেসর আদ্যোপান্ত ঘটনার বর্ণনা দিলেন। তিনজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীকে সঙ্গে করে প্রোফেসর এলেন ওঁর বাগানে। মিঃ মিত্র পাতা উবে যাওয়া প্রত্যেক গাছের নিচে, কাণ্ডে, ডালে এমন কিছু ধূলিকণার মত বস্তু পেলেন, যা দেখে ওঁর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। এক টিপ ধুলো তুলে একটুকরো কাগজে মুড়ে হাসতে হাসতে প্রোফেসরকে বললেন, "আপনার অনুমান ঠিক।"

উদ্ভিদবিজ্ঞানীরাও ওঁর বক্তব্যকে সমর্থন করলেন।

বিকেলে সৌগত এলে, প্রোফেসর ওঁকে বাগান দেখালেন। বললেন, "তোমার সিগন্যাল ডিটেক্টর যন্ত্রটা আপাতত আমার কাছেই থাক। তাছাড়া এই সার্কিটেই আরও কিছু পোর্টেবল ডিটেক্টর তৈরি কর। অন্ততঃ গোটা দশেক। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।"

সৌগত বর্মণের চোখে মুখে কৌতূহল, "এতগুলো ডিটেক্টরের কী দরকার?" বলে বোকার মত চেয়ে রইলেন প্রোফেসরের দিকে।

প্রোফেসর গম্ভীর স্বরে বললেন, "আমার মনে হয় ভিন নক্ষত্রের কোনও জীব পৃথিবীর সবুজ চুরি করছে। গাছের পাতার ক্লোরোফিল চুরি করে তারা পাচার করছে নিজেদের নক্ষত্রে। তোমার সিগন্যাল ডিটেক্টরে, আমি তার সংকেত পেয়েছি। ভিন নক্ষত্রের জীবরা ওই সিগন্যাল অনুসারেই কাজকর্ম করছে।"

"অ্যাঁ!" শিউরে উঠলেন সৌগত বর্মণ।

"হ্যাঁ।" প্রোফেসর বললেন, "গভীর রাতে অপার্থিব বস্তুর একটা সিগন্যাল যন্ত্রটাতে ধরা পড়ে। তখনই সিগন্যাল ডিটেক্টর গণ্ডগোল শুরু করে দেয়। অথচ দিনের বেলায় সব ঠিক!"

"আশ্চর্য!" সৌগত বর্মণ হাঁ হয়ে গেলেন প্রোফেসরের কথা শুনে।

দেখতে দেখতে সাতদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে প্রোফেসরের বাড়ির লাগোয়া রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য বাড়িতে যে সব গাছ ছিল তাদেরও ক্রমে ক্রমে এই একই দশা হল। চারদিক থেকে সবুজ ক্রমশঃ উঠে যেতে শুরু করল! এবং প্রত্যেকটা ঘটনা ঘটলো সেই একই সময়ে। অর্থাৎ মাঝ-রাত্তিরে।

খবরের কাগজের হেডিংয়ে অন্য সংবাদকে ছাপিয়ে প্রাধান্য পেল ক্লোরোফিল চুরির সংবাদ। ক্লোরোফিল চুরির অর্থ শস্যশ্যামল বসুন্ধরার অপঘাতে মৃত্যু! গাছের পাতা না থাকলে গাছের কোনও অস্তিত্ব নেই। গাছ না থাকলে বৃষ্টির অভাব। আর বৃষ্টি না হলে গোটা পৃথিবীর মরুভূমিতে পরিণত হতে বেশীদিন সময় লাগবে না!

অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতায় প্রোফেসর ব্রহ্ম ইতিমধ্যে কাজ অনেকটা এগিয়ে ফেলেছিলেন। ওঁর বাড়িতে লাগোয়া গোটা অঞ্চলটা এখন সেনাবাহিনীর অধীনে। উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করে লোকজন সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। প্রোফেসরের বিশ্বাস, দু-একদিনের মধ্যেই সমস্যার সমাধান হবে। নচেৎ সমূহ ক্ষতি!

সৌগত বর্মণের তৈরি পোর্টেবল সিগন্যাল ডিটেক্টর-গুলো গোটা অঞ্চলের ঝোপে-জঙ্গলে বসিয়ে রাখা হয়েছিল এক একজন অবজারভারের অধীনে। প্রোফেসরের নির্দেশ আছে, নির্দিষ্ট সিগন্যালটি শুনতে পেলেই ওঁকে খবর দিতে।

সামরিক বাহিনীর যে সমস্ত অফিসাররা আছেন, তাঁদের আণবিক অস্ত্র চালানোর জন্য নতুনভাবে ট্রেনিংও দিতে হয়েছে। কারণ, ভিন নক্ষত্রের জীবরা যথেষ্ট শক্তিশালী, তাদের ঘায়েল করতে আণবিক অস্ত্র ছাড়া অন্য পথ নেই!

রাত একটা পর্যন্ত লেবরেটরি রুমের মৃদু নীল আলোটা জেলে সিগন্যাল ডিটেক্টরের সামনে বসেছিল হারু। লেবরেটরি রুমের মধ্যে কেমন যেন আলো আঁধারির মোহাচ্ছন্ন পরিবেশ। একদৃষ্টে সিগন্যাল ডিটেক্টরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু ঝিমুনি এসেছিল। তবু প্রোফেসরের নির্দেশমত ডিটেক্টর আগলে বসে রইল। রাত আড়াইটে। চেয়ারে বসে ঢুলতে শুরু করল। প্রোফেসর বাড়িতে নেই। টহল দিচ্ছিলেন সামরিক বাহিনীর কমাণ্ডারদের সঙ্গে। হঠাৎ টেবিলের ওপরে রাখা সিগন্যাল ডিটেক্টরের স্ক্যানার অজস্র আঁকিবুকিতে ভরে গেল। একটা না একটা অসহ্য কির-কির শব্দে কান মাথা ঝালাপালা হয়ে গেল ওর। টেবিলের ওপর থেকে মাথা তুলে উঠে বসল। এই তো সেই সিগন্যাল! প্রোফেসর যেটা শুনিয়েছিলেন।

নাইট ল্যাম্পের নীল আলোতে বিস্ফারিত চোখে দেখল, দেওয়ালের কোণায় রাখা রাবার গাছের পাতার ওপরে বেশ বড়সড় দুটো শামুক। শামুকের শুঁড় দুটো টেলিস্কোপিক অ্যান্টেনার মত মাথার ওপর তোলা। শুঁড়ের আগায় জোনাকির মত দু ফোঁটা আলো মাঝে মধ্যে জ্বলছে নিভছে। দেখতে শামুক হলেও শম্বুক গতির নয়।

হারু চোখ দুটো রগড়ে নিল। গাছের পাতার ওপর যেখান দিয়েই শামুক দুটো হাঁটছিল সেখানকার সবুজ অংশ দ্রুত উবে যাচ্ছিল। পোর্টেবল সিগন্যাল ডিটেক্টর দু'হাতে ধরে রাবার গাছের কাছাকাছি নিয়ে যেতেই কির-কির শব্দটা উচ্চগ্রামে বাজতে লাগল। স্ক্যানারের আলোর উজ্জ্বলতাও গেল বেড়ে।

সিগন্যাল ডিটেক্টরটা টেবিলের ওপর রেখে হারু এক-দৃষ্টে তাকিয়ে রইল রাবার গাছের দিকে। ডিটেক্টরে 'কির কির' শব্দ হচ্ছিল একটানা। ও ভাবছিল, প্রোফেসরের কথা মত শামুক দুটো তাহলে ভিন নক্ষত্রের জীব? রোবোট শামুক? কিন্তু, ঘরের ভেতরে এল কী করে? গাছের গন্ধ পেয়েই কী এসে জুটেছে? কতগুলো রোবোট শামুক এসেছে পৃথিবীতে? ওদের কী কেউ ছেড়ে দিয়ে যায়? নাকি নিজেরাই আসে? গাছের পাতাগুলো খেয়ে কী আবার ফিরে যায় নিজেদের নক্ষত্রে? ওরা কী স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান?

কী করবে কিছুই ভেবে পেল না হারু। কোনও ভারী বস্তু দিয়ে যে আঘাত করবে, সে সাহসও পেল না। এগিয়ে গেল গাছের দিকে।

টবের ওপরের মাটিতে কিসের যেন গুঁড়ো পড়ে রয়েছে? কিন্তু, আরেকটা শামুক কই? একটু আগেও তো দুটো ছিল। হারু রাবার গাছের এদিক-ওদিক ভাল করে দেখল। কোথায় যেতে পারে শামুকটা? ও দৌড়ে গেল টেবিলের ড্রয়ারের কাছে।

ড্রয়ার থেকে ইলেকট্রনিক টর্চটা বের করে সুইচ টিপল। দিনের আলোর মত উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল ঘরের ভেতরটা। এ আলো সাধারণ টর্চের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। দুটো শামুককেই দেখা গেল সেই আলোতে।

হতচকিত হারু দেখল, টর্চের জোরালো আলো রাবার গাছের ওপরে পড়তেই সাঁ করে দুটো আলোর বিন্দু চোখের পলক পড়তে না পড়তে জানলা গলে ঊর্ধ্বাকাশে মিলিয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে সিগন্যাল ডিটেক্টরের শব্দও গেল থেমে। নিভে গেল স্ক্যানারের স্ক্রিনের জিগজ্যাগ লাইন। শামুক দুটোও বেপাত্তা!

ইলেকট্রনিক টর্চের আলোতে রাবার গাছের চারপাশে ভাল করে দেখে হারু গেল জানলার কাছে। জানলা দিয়ে টর্চের আলো ফেলল আকাশপথে সার্চলাইটের মত। মেঘমুক্ত রাতের আকাশে তখন অসংখ্য তারা মিটমিট করছিল।

ও দ্রুত ফিরে এল রাবার গাছের কাছে। শামুক দুটোর তো কোনও চিহ্নই নেই! বরং রাবার গাছে তখন মাত্র একটা পাতা অবশিষ্ট ছিল। বাকি পাতাগুলো সব রোবোট শামুকের পেটে! একটা পাতা অবশিষ্ট না থাকলে রাবার গাছটাকে চেনাই যেত না। শামুক দুটো কত তাড়াতাড়ি পাতাগুলোকে খেয়ে ফেলল? আশ্চর্য!

ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছিল হারুর। উত্তেজনায় দ্রুত ওঠানামা করছিল বুক। শামুকদুটোর কী গতি? ভাবাই যায় না।

সিগন্যাল ডিটেক্টরের সুইচ অফ করে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। এখনি খবর দিতে হবে প্রোফেসরকে। রাস্তায় পা দিয়েই হারু দৌড়তে শুরু করল।

* * *

এরপর বেশ কিছুদিন প্রোফেসর ব্রহ্ম এবং ওঁর অ্যাসিস্-টেন্ট-কাম-গার্জেন হারু মহান্তির নাম পৃথিবীর ছোটবড় বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রধান খবর হয়ে দাঁড়ায়।

প্রোফেসরের কথামত শহর থেকে গঞ্জ মার্কারি ভেপার ল্যাম্পের আলোতে রাতকে দিন করে দেওয়ার ফলে, ভিন নক্ষত্রের রোবোট শামুকরা আর পৃথিবীর বুকে ক্লোরোফিল চুরি করার জন্য ফিরে আসেনি। কারণ, উজ্জ্বল আলো সহ্য করার শক্তি ওদের ছিল না। ওরা আসত রাতের অন্ধকারে। ওদের তৈরিও করা হয়েছিল সেইভাবে। ইলেকট্রনিক টর্চের উজ্জ্বল আলো গায়ে পড়তেই রোবোট শামুকদুটো। যেই পালাল অমনি সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুঁজে পেলেন প্রোফেসর। অন্ধকার দূর হয়ে যাওয়ার ফলে রোবোট শামুকরা পথ ভুল করল। প্রোফেসর ব্রহ্মের উপস্থিত বুদ্ধির জন্য পৃথিবী আপাততঃ বাঁচল সবুজ হারার ভয় থেকে।

অ্যানেস্থেশিয়ার ইতিকথা

সোমনাথ মজুমদার

অনেকদিন আগের কথা, চিকিৎসা শাস্ত্রের তখন এত উন্নতি হয় নি। অস্ত্রোপচার করার সময় তখন কোন বিবশক পদার্থ ব্যবহার করা হত না। ফলে রোগীর কাছে অস্ত্রোপচার ছিল এক ভয়াবহ ব্যাপার।

ডাক্তার ক্র্যাফোর্ড লঙ ছিলেন এই সময়কার এক তরুণ ডাক্তার। অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর আর্তনাদ খুবই বিচলিত করে তুলেছিল তাঁকে। তিনি ভাবতেন কিভাবে বিনা যন্ত্রণায় রোগীদের অস্ত্রোপচার করা যায়।

যে সময়ের কথা বলছি তখন কিছুদিন হল ইথার আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বস্তুটি শুঁকলে মানুষ প্রথমে উত্তেজিত হয় ও পরে চেতনা হারিয়ে ফেলে।

ডাক্তার লঙ ভাবলেন অস্ত্রোপচারের সময় রোগীকে যদি ইথার শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে রাখা হয় তাহলে রোগী কোন যন্ত্রণা অনুভব করবে না, অথচ নির্বিঘ্নে অস্ত্রোপচার হয়ে যাবে।

এই চিন্তা কাজে পরিণত করতে দেরী হল না ডাক্তার লঙের। জেমস ভেনএবলস্ নামে এক রোগী ছিল ডাক্তার লঙের। জেমসের ঘাড়ে ছিল এক ছোট্ট টিউমার।

1842 খ্রীস্টাব্দের 30শে মার্চ, অস্ত্রোপচারের আগে ডাক্তার লঙ একটি রুমালে খানিকটা ইথার ঢেলে শুঁকতে দিলেন জেমসকে। কিছুক্ষণ পরেই জেমস অজ্ঞান হয়ে পড়তেই ডাক্তার লঙ চালালেন তাঁর ছুরি। জেমস জ্ঞান ফিরে এলে দেখল তার অস্ত্রোপচার শেষ, অথচ সে সামান্যতম যন্ত্রণাও অনুভব করেনি।

বিবশক পদার্থ ব্যবহার করে পৃথিবীর প্রথম অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হল এইভাবে। কিন্তু ডাক্তার বা রোগী কেউই সেদিন কল্পনা করতে পারেন নি যে তাদের অজান্তে তারা এক নতুন যুগের সূচনা করল।

বহুদিন পর যখন ইথারের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং কে এইভাবে প্রথম অস্ত্রোপচার করেন তা নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়েছে, তখন ডাক্তার লঙ তাঁর অভিজ্ঞতা এক প্রবন্ধ মারফৎ প্রকাশ করেন 1849 সালে।

ঐ সময় জর্জিয়ার অনেক উত্তরে কানেকটিকোটের হাডফোর্ডে হোরেস ওয়েলস্ বলে এক ডাক্তার বাস করতেন। একবার নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস শুঁকে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এই ঘটনা থেকে ওয়েলস ভাবলেন যদি দাঁত তোলার সময় রোগীকে এই গ্যাস শুঁকিয়ে অজ্ঞান করা যায় তবে তো রোগী কোন যন্ত্রণা টের পাবে না। 1844 সালে ওয়েলস্ এই গ্যাসের সাহায্যে বিনা যন্ত্রণায় দাঁত তোলেন।

হাডফোর্ড হল ছোট্ট জায়গা, বিনা যন্ত্রণায় দাঁত তুলে এখানে কতই বা রোজগার হবে? এইকথা ভেবে পসার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ডাক্তার ওয়েলস্ হাডফোর্ড ছেড়ে বোস্টনে এসে উঠলেন। বোস্টনে এসে ওয়েলস্ ম্যাসাচুসেট্স হাসপাতালের প্রধান সার্জেন ওয়ারেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে গ্যাস দিয়ে অজ্ঞান করার পদ্ধতি বুঝিয়ে বলেন। ওয়েলসের কথায় ডাক্তার ওয়ারেন এই পদ্ধতিতে রোগীকে অজ্ঞান করে অস্ত্রোপচার করতে রাজী হন।

নাইট্রাস অক্সাইড শোঁকালে মানুষ অজ্ঞান হয়—একথা হোরেস ওয়েলস জানতেন। কিন্তু কি পরিমাণ গ্যাস শোঁকালে মানুষ অজ্ঞান হয় সে সম্বন্ধে তাঁর কোন উপযুক্ত ধারণা ছিল না। ফলে ম্যাসাচুসেটস্ হাসপাতালে ওয়েলস্ রোগীকে যে পরিমাণ গ্যাস শোঁকালেন দুর্ভাগ্যক্রমে তা উপযুক্ত পরিমাণ না হওয়ায় রোগী সম্পূর্ণ ভাবে অজ্ঞান হল না। সার্জেন ওয়ারেন যখন অস্ত্রোপচার আরম্ভ করলেন তখন রোগী যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল।

লজ্জায় অপমানে বোস্টন ছেড়ে পালিয়ে গেলেন ডাক্তার হোরেস ওয়েলস্। নাইট্রাস-অক্সাইড শুঁকিয়ে অজ্ঞান করার প্রচেষ্টা শেষ হল সেখানেই।

এই বোস্টন শহরেই টমাস গ্রীন মর্টন নামে এক দাঁতের ডাক্তার বাস করতেন। জ্যাকসন নামে এক বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন রসায়নবিদের সঙ্গে মর্টনের পরিচয় ছিল। মর্টন ইথার দিয়ে রোগীদের অজ্ঞান করে দাঁত তুলতেন। ইথারের কটু গন্ধের জন্য অনেক রোগী ইথার ব্যবহার করতে রাজী হত না।

মর্টন এই অসুবিধা দূর করতে সচেষ্ট হলেন। জ্যাকসনের কাছ থেকে ইথারের বর্ণ ও গন্ধ দূর করার কৌশল শিখে তিনি লিথিওন নামে এক নতুন পদার্থ তৈরি করলেন।

আঁটঘাট সব বেঁধে মর্টন ডাক্তার ওয়ারেনের সঙ্গে দেখা করলেন। অনেক অনুরোধের পর ডাক্তার ওয়ারেন রাজী হলেন লিথিওন দিয়ে অস্ত্রোপচার করতে।

1846 সালের 16ই অক্টোবর লিথিওন দিয়ে নির্বিঘ্নে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হল। চারদিকে ডাক্তার মর্টনের জয়জয়কার পড়ে গেল।

অলিভার হোমস্ তখন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি এই পদ্ধতির নামকরণ করলেন অ্যানেস্থেশিয়া, যে বস্তু দিয়ে অজ্ঞান করা হয় তার নাম হল অ্যানেস্থেটিক ও যিনি অজ্ঞান করেন তাঁকে বলা হতে লাগল অ্যানেস্থেশিস্ট। মর্টন কিন্তু তার সাফল্যের স্বীকৃতি পেলেন না। তার সাফল্যের স্বীকৃতির পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালেন ডঃ জ্যাকসন।

উভয়ের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা চলতে লাগল, উভয়ের প্রতিবাদে উভয় ব্যক্তির দাবী গেল বাতিল হয়ে। অবশেষে মোক্ষম আঘাত দিলেন ডাক্তার লভ। তিনি প্রমাণ করলেন

[পরের পাতায়]

পৃথিবীর আকার ও জ্যামিতির ধারণা

শ্রী অরুণ চট্টোপাধ্যায়

'জ্যা' শব্দের অর্থ ভূমি ও 'মিতি' শব্দের অর্থ পরিমাণ—উভয়ের মিলিত অর্থ পরিমাপ।

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, পৃথিবীর আকার গোল অতএব তার পৃষ্ঠে কোন সরলরেখা বা সমতল পাওয়া কোনো-ভাবেই সম্ভব নয়। সুতরাং ভূমির পরিমাপে সরলরেখা ও সমতলের ব্যবহার অসম্ভব অর্থাৎ জ্যামিতি দিয়ে ভূমির পরিমাপ সম্ভব নয়—যেহেতু এই শাস্ত্র সরলরেখা ও সমতলের পরিমাপ সংক্রান্ত হিসাবই করে থাকে।

এখন আমাদের যে জিনিসটা জানতে হবে তা হল ভূমির পরিমাপ ও পৃথিবীর পরিমাপ বস্তুত এক নয়। পৃথিবী একটা বিরাট ব্যাসার্ধের (প্রায় চার হাজার মাইল) বৃত্ত হওয়ায় এর পৃষ্ঠদেশের অল্প কয়েক মাইল স্থান প্রকৃত-পক্ষে বৃত্তচাপ হলেও তা প্রায় সামতলিক ক্ষেত্রের মতই আচরণ করে থাকে। বাস্তব গণনায় দেখা যায় ভূপৃষ্ঠ বরাবর এক মাইল দূরত্ব (প্রকৃতপক্ষে যা একটি বৃত্তচাপ) সরলরৈখিক হিসেবে দাঁড়ায় 0·9863 মাইল। অর্থাৎ ভুলের শতকরা পরিমাণ মাত্র 1·37 ভাগ। যা এতই তুচ্ছ যে অনায়াসেই উপেক্ষা করা যায়। আমাদের জায়গাজমির ক্ষেত্রে এই ভুলের পরিমাণ (শতকরা হার একই থাকে) হয় অত্যন্ত কম যেহেতু জায়গা-জমির পরিমাণ সাধারণত কয়েকশ গজের মধ্যেই হয়ে থাকে।

ধরা যাক হাওড়া থেকে দিল্লীর দূরত্ব বলা হল প্রায় দেড় হাজার মাইল। তা কিন্তু সরলরৈখিক দূরত্ব নয়। তা হল বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য, যেহেতু ভূপৃষ্ঠ বরাবর তা মাপা হয়েছে। একইভাবে কোলকাতা থেকে ওয়াশিংটন বা মস্কোর দূরত্ব ও বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য এবং তা সরলরৈখিক নয়।

পৃথিবীর বিভূলাকারের (বলের মত) জন্যই সাধারণ সামতলিক জ্যামিতির পরিবর্তে পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয় কৌণিক জ্যামিতি। কোনো স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য যে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ উল্লেখ করা হয় তা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোণের পরিমাপ—দৈর্ঘ্যের নয়। তবে এই কোণ থেকেই ভূপৃষ্ঠ বরাবর দৈর্ঘ্য (এখানে বৃত্তচাপ) মেপে নেওয়া যায় নিচের সূত্র সাহায্যে ঃ

$$\theta \text{ রেডিয়ান} = \frac{\text{চাপ}}{\text{ব্যাসার্ধ}}$$

θ = কোণের সংকেত।

সুতরাং অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ জানা থাকলে এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধ জানা থাকলে অতি সহজেই দুই স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক A ও B দুই স্থানের অক্ষাংশের মাপ যথাক্রমে 30° উত্তর এবং 60° উত্তর (উত্তর মানে বিষুবরেখার উত্তরে)। উভয়েই একই দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এই দুই স্থানের দূরত্ব জ্যামিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে হবে।

$$\theta \text{ রেডিয়ান} = \frac{\text{চাপ}}{\text{ব্যাসার্ধ}} \quad \text{সূত্রানুযায়ী,}$$

$$\frac{\pi}{6} = \frac{\text{AB চাপ}}{4000}$$

(π = কোনো বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত = $\frac{22}{7}$ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ধরা হল 4000 মাইল)

গণনা করে পাওয়া গেল AB চাপের দৈর্ঘ্য প্রায় 2095 মাইল। পৃথিবীর পরিমাপে যে কৌণিক ও বৃত্তীয় জ্যামিতির সাহায্য নেওয়া হয় তারা কিন্তু জ্যামিতিরই শাখা। শুধু পৃথিবীর পরিমাপই নয়, মহাকাশের কোনো গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদির দূরত্ব মাপার ক্ষেত্রে এই কৌণিক জ্যামিতিরই সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে সামতলিক জ্যামিতির নয়।

181/44, জি. টি. রোড
পোঃ বৈদ্যবাটী, হুগলী

যে তিনিই প্রথম বিবশক পদার্থ ব্যবহার করে অস্ত্রোপচার করেন।

অ্যানেস্থেশিয়ার ইতিহাসে এরপর আবির্ভূত হলেন জেমস ইয়ং সিমসন। বিবশক পদার্থ হিসাবে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করে তিনি অ্যানস্থেশিয়ার ইতিহাসে এক যুগান্তর নিয়ে আসেন।

সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে অ্যানস্থেশিয়ার কলাকৌশল, আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক নতুন নতুন বিবশক পদার্থ। কিন্তু আজও রোগী অস্ত্রোপচারের পূর্বে অজ্ঞান হবার সময় ভাবে তাকে বুঝি ক্লোরোফর্ম করা হচ্ছে। ডাক্তার সিমসনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বোধহয় এইখানেই।

c/o Biswanath Mazumdar
P.O. Hakimpara Shivaji Road
Dist Jalpaiguri-745101

লাল সিগন্যালে সবুজ ক্রসিং

সাধন কুমার গিরি

কাউকে বোকা বানাতে গিয়ে নিজেই বোকা বনে যাওয়ার এক মজার ঘটনা তোমাদের শোনাই।

ভদ্রলোকের নাম আর. ডব্লিউ. উড। পেশায় ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানী। একবার উনি রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলেছেন—হঠাৎ পুলিশ এসে ধরলো ক্যাক করে। কি ব্যাপার? না, উনি রাস্তার মোড়ে সিগন্যালে লাল আলো জ্বলতে দেখেও গাড়ি না থামিয়ে চলে এসেছেন।

উড্ সাহেবকে নিয়ে যাওয়া হলো কোর্টে। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন,—এই যে মিঃ উড্, আপনি রাস্তার সিগন্যালে লাল আলো জ্বলতে দেখেও গাড়ি থামালেন না কেন?

উড্ সাহেব গম্ভীরভাবে বললেন,—এ ব্যাপারে আমার কোন দোষ নেই। গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় সিগন্যালে লাল আলো আমার কাছে সবুজ বলে মনে হলো।

তা কি করে হয়? লাল আলোকে সব সময় লালই তো দেখি আমরা। জজ সাহেব তো রীতিমত বিস্মিত।

ব্যাপারটা বোঝাতে গেলে আপনাকে পদার্থ বিজ্ঞানের এক তত্ত্ব বোঝাতে হয়। বিজ্ঞানী তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন।

লক্ষ্য করে দেখবেন—ট্রেন হুইসল দিতে দিতে আমাদের কাছে যত এগিয়ে আসে—আমাদের সেই হুইসলের আওয়াজ ততই জোরালো বলে মনে হয়। দেখা গেছে—কোন চলন্ত বস্তুর কাছে আসা বা দূরে চলে যাওয়ার শব্দ বা আলোর কম্পন সংখ্যা বা frequency বাড়া কমার একটা সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ —আওয়াজ বা আলোর উৎসের কাছে যদি দ্রুতবেগে এগিয়ে যাওয়া যায় তবে সেই আওয়াজ বা আলোর কম্পন সংখ্যা বাড়বে,—কমবে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। এরই নাম ডপলার এফেক্ট।

রাস্তায় সিগন্যালের ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে। আমি জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, ফলে সিগন্যালে লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে গিয়ে লাল রঙটা আমার চোখে সবুজ বলে মনে হল। আমি গাড়ি না থামিয়ে ক্রসিংটা সোজা পার হয়ে গেলাম।

জজ-সাহেব পদার্থ বিজ্ঞানের এই গূঢ় তত্ত্বটি বুঝতে পেরেছেন এমন একটা ভান করে উড্‌কে ছেড়ে দিতেই যাচ্ছিলেন—বাদ সাধলো এক ছোকরা।

জজ সাহেব যখন রায় লিখতে যাবেন—ছোকরাটি গিয়ে দাঁড়ালো তাঁর পাশে। ছেলেটিকে দেখে চিনতে পারলেন উড্, তাঁরই ছাত্র। একবার পদার্থ বিজ্ঞানে ফেল করিয়েছিলেন ওকে। ছেলেটি কানে কানে কিছু বলতেই একেবারে সোজা হয়ে বসলেন জজ-সাহেব। বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে বললেন—

আপনার কথা মেনেই নিলাম। সত্যিই আপনি লাল আলোকে সবুজ দেখেছিলেন। তবু আপনি কত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন একটু বলবেন কি?

বিজ্ঞানী মাথা চুলকোলেন। সত্যি তো—ডপলার এফেক্টের জন্য লাল আলোকে সবুজ দেখাতে হলে গাড়িটাকে প্রায় আলোর গতিবেগেই ছোটাতে হয়।

জজ সাহেব হেসে বললেন—আপনাকে জরিমানা দিতে হবে মিঃ উড্—তবে তা আপনি ট্রাফিক সিগন্যাল মানেননি বলে নয়—জরিমানা আপনি দেবেন মাত্রাতিরিক্ত speed-এ গাড়ি চালানোর জন্য। জজ-সাহেবকে বোকা বানাতে গিয়ে বিজ্ঞানী নিজেই বোকা বনে গেলেন।

জরিমানার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের যে তত্ত্বটি আদালতে হাজির করেছিলেন উড্ সাহেব—তার আবিষ্কর্তা অস্ট্রেলীয় পদার্থ বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান ডপলার। কোনও আওয়াজের উৎসের দিকে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়ার সময় আওয়াজের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে—একথাটা ডপলার বলেছিলেন 1842 সালে। ডপলারের এই তত্ত্বের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক রহস্যের সমাধান করা হয় 83 বছর বাদে। দূরের নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে যে আলো পৃথিবীতে এসে পড়ে তার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে—তাতে লাল আলোর মাত্রা বেশি। এতেই প্রমাণিত হয় আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ কমবে; আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়লে বর্ণালীতে বেগুনী আলোর পরিমাণটা বাড়তো। নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ যে কমেছে—এ থেকে বিজ্ঞানীদের ধারণা—নক্ষত্রগুলো ক্রমশঃ সৌরজগৎ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

এখন থেকে প্রায় 150 বছর আগে ডপলার সাহেব যে প্রাকৃতিক নিয়মের কথা বলেছিলেন তারই সাহায্যে বিজ্ঞানীরা আজ বুঝেছেন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে আর সেই সঙ্গে নক্ষত্ররা দূরে সরে যাচ্ছে একে অপরের কাছ থেকে।

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ।। দাম বারো টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ / ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

স্বাস্থ্যই সম্পদ

স্বাস্থ্যরক্ষায় প্রগতিশীল উদ্যোগ

আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীর রোগ নিরাময়ের চাইতে রোগ প্রতিরোধ ও তার উৎস সন্ধান করে নির্মূল করাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই উদ্দেশ্যে বামফ্রন্ট সরকারের নয় বছরব্যাপী শাসনকালে দেশের জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অনুসৃতনীতি অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করেছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই দপ্তরটিকে প্রাথমিক স্তর থেকে ঢেলে সাজিয়ে শহর-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে গ্রামমুখী করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য সহায়ক কাঠামোটি ৪টি স্তরে বিন্যস্ত—উপকেন্দ্র, সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও গ্রামীণ হাসপাতাল। এই স্তরগুলিতে বিভিন্নমুখী চিকিৎসার সুযোগবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শয্যা সংখ্যা, কর্মী সংখ্যা ও আনুষঙ্গিক সাজ সরঞ্জাম বাড়ানো হয়েছে। ১৯৭৬ সালের তুলনায় ১৯৮০ সালে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বহুমুখী উন্নতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। মাথাপিছু বরাদ্দ ১৫.৯০ প: স্থলে ৩৭.০৭ প: হয়েছে। ৩৪২টি হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এখন হয়েছে ৪০৯টি (স্বাস্থ্যকেন্দ্র বাদে)। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর বর্তমান সংখ্যা ৪১,২৩২ —যা কিনা পূর্বে আদৌ ছিল না। এছাড়া নূতনতর সংযোজন ৭৮টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় ও সুন্দরবন এলাকায় ভাসমান লঞ্চে আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র—যার সুফল গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, সাধারণ মানুষ পেয়ে চলেছেন ব্যাপকহারে।

মহামারী আকারে রোগ প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্যসেবীদের সাহায্যে বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সমবায়ে 'টাস্ক ফোর্স' গঠন করা হয়েছে। যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সর্বস্তর কর্মরত চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর রূপায়ণে প্রসূতি মা ও শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। "ছোট পরিবারের" ধারণাটি জনপ্রিয় হয়েছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটিকে দূরদূরান্তে প্রসারিত করা এবং সাধারণ মানুষ যাতে প্রয়োজনে চিকিৎসার সুযোগলাভে বঞ্চিত না হন সেদিকে নজর রাখাই এই সরকারের লক্ষ্য।

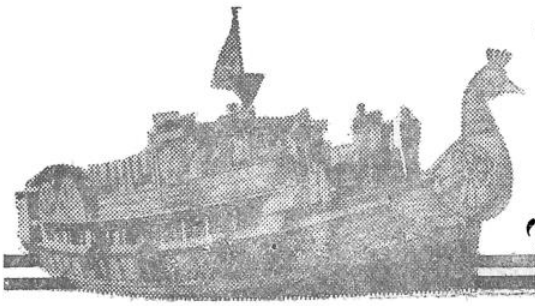

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস

বর্ণারূপ-অনিল কর্মকার
চিত্ররূপ-গৌতম কর্মকার

ভোর হবার পর ···
উঃ, বিরাট উপত্যকাটা যেন একটা শ্মশান-ক্ষেত্র। পূর্ণদগ্ধ আর অর্ধ দগ্ধ মৃতদেহের স্তুপ। গাছগুলোর মাথা পুড়ে ছাই।
যেন সুবিশাল এক মৃত্যুপুরী। তার মাঝখানে-- ঐ-ঐ দেখুন, তিন তিনটে যন্ত্রদানব -- আমাদের পালাতেই হবে।
প্রাণপণে আমরা ছুটলাম--
উঃ, চার পাশ কী আশ্চর্য রকমের স্তব্ধ! পাখীগুলো পর্যন্ত ভয়ে বোবা হয়ে গেছে।
কারা যেন আসছে। হ্যাঁ, তিন জন অশ্বারোহী। সামনে লেফটেনান্ট।
এদিককার কী খবর?
সব কামান ধ্বংস হয়ে গেছে স্যার। সৈন্যদলও সব শেষ। উঃ, কী ভীষণ আমাদের শত্রু!
ওরা দেখতে কেমন?
ওরা মানুষ নয় স্যার, দৈত্য। শ'খানেক ফুট উঁচু। তিনটে করে পা-চকচকে গা, মাথাটা গম্বুজের মতো--
18

কী বাজে বকছো?
না স্যার, সত্যি বলছি। মাইলখানেক গেলেই ওদের দেখতে পাবেন। ওদের সঙ্গে একরকম বাক্স আছে। তা থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে সব ছাই করে দেয়।
ঠিক আছে। আমি নিজেই দেখছি।
মাইলখানেক গেলেই ওদের দেখা পাবো তো?
হ্যাঁ স্যার, তার আগেও পেতে পারেন।
ঠিক আছে, ধন্যবাদ।
এগিয়ে চললাম আমরা। লোকজন পালাচ্ছে। স্থানে স্থানে গোলন্দাজ বাহিনী কামান সাজিয়ে তৈরী।
স্টেশনে এসে দেখলাম - কী ভীড়! দেশ ছেড়ে সবাই পালাচ্ছে।
অবশেষে আমরা টেমস নদীর তীরে এসে পৌঁছলাম। দেখি, যদি নৌকা একটা পাই।
নৌকা একটা যাবে। কিন্তু কী ধাক্কাধাক্কি আর হট্টগোল। শত্রু সম্পর্কে কারোই কোনও ধারণা নেই। তাই ভাবছে - পালিয়ে সবাই বেঁচে যাবে।
19

হঠাৎ ঘুরে দেখা গেল সেই মঙ্গল-গ্রহের যন্ত্রদানব। আমাদের দিকেই আসছে।
সাবধান! সাবধান হোন সবাই!
আমাদের সৈন্যরা তখুনি কামান দাগা শুরু করে দিল।
গুম... গুড়ুম... গুম...
ওরা এবার শুরু করলো সেই তাপরশ্মির বিকীরন।
---জজজজজ---
বুউউম...
সর্বনাশ! সব ছাই হয়ে গেল। ওরা এবার নৌকাটার দিকে ফিরছে। সাবধান! যদি বাঁচতে চান, তবে নদীতে ঝাঁপ দিন।
ঝুপ...
ঝপাং...
উঃ, নদীর জল বাষ্প হয়ে উঠে যাচ্ছে। বাকী জল টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে। আর বাঁচবার কোনও উপায় নেই।
20

স্যার ডেরেকের নোটবুক

নীলশীষ সিংহ

তখন আমি সুইস কোম্পানী কিমি বেসিলের এজেন্ট হিসাবে যুক্তরাজ্যে কাজ করছি। আমার কাজ বিভিন্ন গবেষণাগারে কিমি বেসিলের উন্নতমানের রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করা। আর সেই সূত্রেই আলাপ ডঃ আদিত্যর সঙ্গে। ডঃ আদিত্য তখন অক্সফোর্ডে দ্বিতীয়বারের জন্য ডক্টরেট করছেন। বিষয়টা বেশ অত্যাধুনিক ঃ নাইট্রোজেন যৌগীকরণ। আমরা জানি বাতাসে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে। কিন্তু এই নাইট্রোজেনকে যৌগে পরিণত করা দুরূহ। মানুষের প্রধান খাদ্য উদ্ভিদ। আর উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য নাইট্রোজেন কিন্তু শুধুমাত্র নাইট্রেট, নাইট্রাইট, অ্যামোনিয়াম লবণ, ইউরিয়া আর অ্যামোনিয়ারূপেই উদ্ভিদজগৎ নাইট্রোজেনকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করতে পারে। তথাকথিত রাসায়নিক সার মূলতঃ নাইট্রোজেন যৌগ। এবং আমরা যে সবুজ বিপ্লব দেখছি তার ভিত্তি হলো নাইট্রোজেনের যৌগীকরণ। গত শতাব্দীতে রাসায়নিক সার বলতে দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে প্রাপ্ত সোডিয়াম নাইট্রেট বা চিলির সোরাকেই বোঝাতো। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে চিলির সোরার সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে ওঠার ফলে যুদ্ধলিপ্ত জার্মানী নাইট্রোজেনের যৌগীকরণে মনোনিবেশ করে। পরিণামে ফ্রিজ হাবের ও কার্লবশ নামের দুই বিজ্ঞানী বাতাসের নাইট্রোজেন ও জলের হাইড্রোজেন থেকে সুলভে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের প্রযুক্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

কিন্তু সুলভ বললেও ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই সুলভ নয়। পদ্ধতিগত কারণেই অ্যামোনিয়া উৎপাদনের কারখানা বিশাল ও খরচসাপেক্ষ। এতে প্রচুর তাপশক্তিও ব্যয় হয়। বর্তমানে প্রচেষ্টা হচ্ছে কি করে অল্প তাপাঙ্কে ছোটখাটো কারখানায়

যৌগীকরণ সম্পন্ন করা যায়। সম্প্রতি কিছু জটিল লবণের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলি বাতাসের নাইট্রোজেন শোষণ করতে পারে। যদিও শোষিত নাইট্রোজেনকে যৌগ রূপে বিমুক্ত করার ব্যাপারটা এখনও সহজসাধ্য হয়নি। ডঃ আদিত্য অক্সফোর্ডে ওই ধরনের উন্নতমানের লবণ আবিষ্কারে ব্যাপৃত ছিলেন। যা থেকে সহজে নাইট্রোজেন বিমুক্ত করাও সম্ভব।

এসব কথা আমার ডঃ আদিত্যর কাছেই শোনা। অজৈব রসায়নের অত্যাধুনিক তথ্যাদি আমার জানার কথা নয়। অক্সফোর্ডে গেলে আমি তাঁর অ্যাপার্টমেন্টেই উঠতাম। রাত্রে খাবার টেবিলে বসে নানান বিষয়ে কথা হতো। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান সেই তরুণ বিজ্ঞানীর অজস্র কথা আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতাম।

সেবার সুইজারল্যাণ্ডে মাস তিনেকের মত ছুটি কাটিয়ে যুক্তরাজ্যে ফিরলাম। তখন কি জানতাম প্রবল বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়-শহরে? ডঃ আদিত্যর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে দেখি দরজা তালা বন্ধ। নেম প্লেটে কোন এক গোলাম রববানীর নাম লেখা। চলেই আসছিলাম, হঠাৎ পাশের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো ডঃ আদিত্যর বন্ধু, মেক্সিকান গবেষক অসকার মেলডোনাডো। মেলডোনাডো আমায় দেখে স্প্যানিশ ভাষায় হুড় হুড় করে কি সমস্ত বলে গেল। তারপরেই খেয়াল হতে আমাকে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলো, আদিট্য কোথায় জানো?

—কেন? আদিত্য কোথায় গেছে? আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

—সেইটাই তো প্রফেসর ডেরেক বলডুইন জানতে চাইছেন। ও তিন মাস আগে উধাও হয়েছে কাউকে কিছু না জানিয়ে। লাবরেটরীর যাবতীয় নোটবুকও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। চ'লোতো তুমি প্রফেসর বলডুইনের কাছে।

স্যার ডেরেকের সঙ্গে আমার আলাপ নেই। আমার মত সরবরাহকারীর সঙ্গে আলাপের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। যদিও আমি তাঁর ল্যাবরেটরীতে নিয়মিত মাল সরবরাহ করি। আমার দৌড় তাঁর সেক্রেটারি মিস মারকেট পর্যন্ত। কিন্তু সেদিন মেলডোনাডো আমাকে সোজা স্যার ডেরেকের কাছেই নিয়ে গেল। বললো, স্যার, এ হচ্ছে ক্যালকার্টান, আডিট্যর বন্ধু।

স্যার ডেরেক আদিত্যর ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। আমি আমার নোটবুক খুলে আদিত্যর মার বেলঘরিয়ার ঠিকানাটা বললাম। স্যার ডেরেক বললেন, ও ঠিকানা তো আমারও জানা। কিন্তু ওটাই কি ওর সত্যিকারের ঠিকানা? কোনও ঠিকানাতেই ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। ল্যাবরেটরীতে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা চলছিল। গুরুত্বপূর্ণ নোটবুক নিয়ে পাজী বাঙ্গালীটা হাপিশ। কাজে কাজেই আমাকে ইণ্টারপোলে খবর দিতে হয়েছে। কিন্তু ইণ্টারপোলও ওকে খুঁজে পাচ্ছে না....

চিন্তিত হয়ে ফিরে এলাম। তবে বুঝলাম ডঃ আদিত্য তাঁর গবেষণায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। নাইট্রোজেন যৌগীকরণের সহজ পদ্ধতি এখন তাঁর করায়ত্ত। সেই সমস্ত নোটপত্র নিয়েই ডঃ আদিত্য হাওয়া। আর বিষয়টা প্রফেসর বলডুইনের কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি গবেষণাটাকে প্রতিরক্ষা বিষয়ক বলে চালাচ্ছেন।

কিন্তু এসবও দেড় বছর আগেকার কথা। এতদিনে আমি কিমি বেসিলের চাকরি ছেড়ে জাইরেতে। ওখানে জাপানী কোম্পানী মিটসুবিশীর হয়ে নানাধরনের মোটর বিক্রি করছি। সম্প্রতি মাসখানেকের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরেছি।

তবে দেশে ফিরে যে এইভাবে ডঃ আদিত্যর সঙ্গে মোলাকাত হবে তা কি জানতাম! কয়েকজন বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সুন্দরবন ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। ভ্রমণ মন্দ হয়নি। কিন্তু ফেরার পথে লঞ্চডুবির বিপত্তির মধ্যে পড়ে গেলাম। গোসাবাতে লঞ্চ নোঙ্গর করার সময়ে পাশের আধভাঙ্গা জেঠির শালবল্লীর সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল লঞ্চের। ফলে খোলের একটা কাঠে চিড় ধরেছিল। সেই চিড়ই ফাঁক হয়ে জল ঢুকতে লাগলো লঞ্চের খোলে। তখন প্রায় নটা। সারেং বলল, লঞ্চ তীরের দিকে ভেড়াচ্ছি।

ভেড়ালে কি হবে, যেখানে লঞ্চ থামলো সেখানে গলা জল। তীরে কোনও গ্রাম আছে বলে মনে হলো না। কয়েকটা টর্চ সম্বল করে জলে নেমে পড়লাম কয়েকজন। নারী-পুরুষ মিলে যাত্রী প্রায় চল্লিশ জন। সবাইকে আস্তে আস্তে জলকাদার মধ্য দিয়ে তীরে আনা গেল। তীরে বনবাদাড় আর ধানক্ষেত। সেই বনবাদাড়ের মধ্য দিয়ে একটা আলোর রেখা দেখা গেল। আলোর রেখা মানে যে সে আলো নয়—বৈদ্যুতিক টিউব লাইটের আলো। বনবাদাড় ভেঙ্গে ধানক্ষেতের আলপথ বেয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম সেই আলো লক্ষ্য করে।

পাকা বাড়িই, তবে ছোটোখাটো। গেটের মাথায় সাইনবোর্ড, জয় গোপাল দাস স্মৃতি মৃত্তিকা গবেষণাগার। হাক ডাক করতে একজন গ্রাম্য লোক এসে কোলাপসিব্‌ল গেট খুলে দিল। পাজামা ও পাঞ্জাবী পরিহিত এক যুবাও এসে দাঁড়ালেন গেটের কাছে। আমরা আমাদের কথা ব্যক্ত করলাম; রাতের আশ্রয় চাইলাম।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়! তিনি হাত বাড়িয়ে আমাদের আহ্বান জানালেন।

ওনার গলার আওয়াজ শুনেই আমি চমকে উঠলাম। মোটা ফ্রেমের চশমা ও চাপদাড়ি যুক্ত যুবককে আমি ভালোভাবে লক্ষ্য করতে লাগলাম। হঠাৎ আমার মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। ডঃ আদিত্য! কিন্তু ডঃ আদিত্য কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমার চেহারাও আগের মত নেই।

মাথার সামনের দিকটায় টাক পড়েছে। আমারও এখন মুখ ভর্তি দাড়ি।

মনের উত্তেজনা মনে চেপেই ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ছোটবাড়ি, জায়গা তেমন নেই। মাঝারি সাইজের একটা গবেষণাগার। ছোট একটা অফিস ঘর আর ডঃ আদিত্যর নিজস্ব একটা ঘর। এছাড়া ফুট দশেক চওড়া আর চল্লিশ ফুট লম্বা একটা প্যাসেজ—যার শেষে বাথরুম আর রান্নাঘর। আমরা সেই প্যাসেজেই আশ্রয় নিলাম।

ডঃ আদিত্য ঘরটা খুলে দিয়ে বললেন, এ ঘরটাও ব্যবহার করতে পারেন।

—কিছু মনে করবেন না, আমার এক সহযাত্রী জিজ্ঞেস করলেন ডঃ আদিত্যকে, আপনার নামটা ?

—বিশ্বনাথ দাস। ডঃ আদিত্য জবাব দিলেন।

—এটা কি সরকারী ল্যাবরেটরী ?

—না, আমার নিজস্ব। পৈতৃক জমিজমা বিক্রি করে গড়ে তুলেছি সুন্দরবনের মাটি পরীক্ষা করার জন্য।

ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে আমরা যে যার জায়গা করে নিলাম। যদি একটু ঘুমানো যায়। ডঃ আদিত্য ওরফে বিশ্বনাথ দাসও নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন। আমি কায়দা করে অফিস ঘরেই আশ্রয় নিলাম। ছোট অফিসঘর। গোটা দুয়েক টেবিল, গোটা পাঁচেক চেয়ার, একটা গডরেজ টাইপরাইটার আর দুটো একটা আলমারী। ঘরে ঢুকে এটা-ওটা টানাটানি করতে লাগলাম। টাইপরাইটারের টেবিলের ড্রয়ার খুলতে একগাদা পুরনো কার্বন পেপার বেরুলো। পুরনো কার্বন পেপার থেকে লেখা উদ্ধার করার ব্যাপারে আমার দক্ষতা অসীম। কার্বন পেপার পড়তে পড়তে আমার ভ্রূ কুঁচকে গেল। ইসরায়েলের সঙ্গে চিঠি চালাচালি করছেন ডঃ আদিত্য। অতি সস্তায় অ্যামোনিয়া তৈরির প্রযুক্তি বিক্রি করবেন !

তাহলে সস্তায় নাইট্রোজেন যৌগীকরণের পদ্ধতি এখন ডঃ আদিত্যর করায়ত্ত। বেচারা ডেরেক বলডুইন ! একটা বিরাট আবিষ্কার তাঁর হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে। অথচ পরিকল্পনা ও গবেষণাগার তাঁরই। কিন্তু আমি ধর্মদাস কর্মকার কী করতে পারি ? স্যার ডেরেকের ল্যাবরেটরীর নোটবইটা ডঃ আদিত্য কোথায় রেখেছেন ? অবশ্যই এই স্টীল আলমারী-গুলোর মধ্যে। কিন্তু এগুলোর চাবি ? কোথায় থাকতে পারে ? ডঃ আদিত্যর ঘরে একটা রাইটিং টেবিল দেখেছি। তার একটা ড্রয়ার আছে।....কিন্তু ডঃ আদিত্য তো দরজায় খিল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। তিনি কি একবারও বাথরুমে যান না ?

আমি অফিসঘরের চেয়ারে বসে হাই তুলতে লাগলাম। কিন্তু আমাকে ঘুমোলে চলবে না।

রাত আড়াইটার সময়ে খুট করে একটা আওয়াজ হলো। তারপর হাওয়াই চটির ফটফট আওয়াজ। ডঃ আদিত্য নিশ্চয় বাথরুমে যাচ্ছেন। ডিঙ্গি মেরে উঠে দাঁড়ালাম আমি। বাথরুমের দরজা বন্ধ করার একটা আওয়াজ শোনা গেল। নেংটি ইঁদুরের মত দ্রুত ও নিঃশব্দগতিতে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরের প্যাসেজে আমার সহযাত্রীরা। সবাই ঘুমিয়ে। কিন্তু জেগে বসে আছেন সহযাত্রী ধীরেনবাবু। তর্জনী তুলে ঠোঁটে ঠেকিয়ে তাঁকে চুপ করে থাকতে ইশারা করলাম। ধীরেনবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি সোজা সেঁদিয়ে গেলাম ডঃ আদিত্যর ঘরে। একেবারে খাটের তলায়। বেরুলাম একঘণ্টা পরে।

চাবির গোছা হাতে নিয়ে। ডঃ আদিত্য তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

স্টীল আলমারী খুলে স্যার ডেরেকের নোটবই খুঁজে বের করতে তেমন অসুবিধা হলো না। অক্সফোর্ডের অজৈব রসায়ন গবেষণাগারে ওরকম খাতা আমি অনেক দেখেছি। সঙ্গে আগে দুটো স্বদেশী খাতা নিলাম। সেগুলো ডঃ আদিত্যর নিজস্ব নোটবই।

ডঃ আদিত্য ঘুম থেকে উঠলেন বেলা ছটায়। ততক্ষণে আমরা জেনে গেছি নিকটবর্তী গণ্ডগ্রাম হচ্ছে মোল্লাহাট। সেখান থেকে হাসনাবাদে ফেরার জন্য বড় নৌকা পাওয়া যেতে পারে। ঘণ্টা তিনেকের মত সময় লাগে পৌঁছতে।

ডঃ আদিত্য টুথব্রাশ নিয়ে বেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি নিঃশব্দে তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। শান্তকণ্ঠে ঘোষণা করলাম, ডঃ আদিত্য, প্রফেসর বলডুইনের খাতাটা আমি ওনাকেই ফেরত দিয়ে দেব।

ঘাড় ফিরিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন ডঃ আদিত্য। ক্রমে তাঁর দৃষ্টির বিস্ময় রূপান্তরিত হলো বিধ্বংসী ক্রোধে।

—ওরে কামারের ছা! শেষ পর্যন্ত তুই এখানে জুটেছিস! ডঃ আদিত্য একছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। টেবিলের ড্রয়ার খুলে কি যেন খোঁজাখুজি শুরু করলেন।

—রিভলবারটা আমার কাছে, কাল রাতে চাবির গোছার সঙ্গে ওটাও বের করে নিয়েছি ডঃ আদিত্য। বেশি ট্যাঁ ফোঁ করবেন না, ইণ্টারপোল আপনাকে খুঁজছে। আমি দৃপ্তকণ্ঠে জানালাম।

কিন্তু ডঃ আদিত্য নিরস্ত হলেন না। ড্রয়ার থেকে একটা পেন্সিল কাটা ছুরি বের করে নিয়ে ধেয়ে এলেন আমার দিকে।

আমার ডান হাতটা একটু তুলতে হ'লো। একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন ডঃ আদিত্য। কিছু দিন আমি এক ব্ল্যাকবেল্টের শিক্ষানবিশী করেছিলাম।

কদিন বাদে প্রফেসর বলডুইনকে পাঠিয়ে দিলাম তাঁর নোটবুক। সঙ্গের চিঠিতে লিখলাম ঃ

শ্রদ্ধেয় স্যার ডেরেক

আপনার খোয়া যাওয়া নোটবই ডঃ আদিত্যর কাছ থেকে নিয়ে ফেরৎ পাঠালাম। আমার এক রসায়নবিদ বন্ধুকে নোটবইটা পড়িয়ে জেনেছি ডঃ আদিত্য একটি টিটানিয়াস ধাতুঘটিত জটিল যৌগ আবিষ্কার করেছেন, যার দ্বারা সহজেই বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়ায় পরিণত করা যায়। এই আবিষ্কার নিঃসন্দেহে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে দেবে। আপনাকে আমার অনুরোধ—দয়া করে এটার পেটেণ্ট নেবেন না। এমনি পেপার করুন—যাতে পৃথিবীর সব জাতি আবিষ্কারটাকে কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ দেশের শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে। পেপারে অবশ্যই ডঃ আদিত্যর নামটা দেবেন। এছাড়া ওঁর নামে ইণ্টারপোলের কাছে মিথ্যা অভিযোগটাও তুলে নেবেন। ধন্যবাদান্তে, ভবদীয়

ধর্মদাস কর্মকার, ভূতপূর্ব এজেণ্ট, কিমি বেসিল

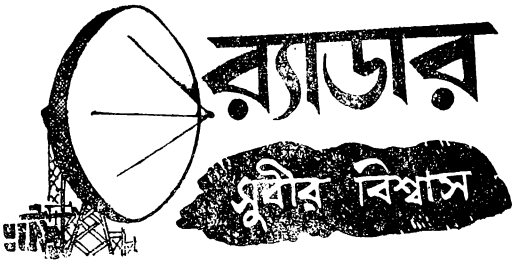

আচ্ছা রাত্রিবেলা কোন একটা ফাঁকা মাঠে যদি তোমরা দিয়ে দাঁড়াও তবে কিছুই দেখতে পাবে না। কিন্তু এবার যদি একটা টর্চ জ্বালাও তবে ঐ টর্চ থেকে আলো গিয়ে গাছ, বাড়ী প্রভৃতির ওপর গিয়ে পড়বে, আর ঐ আলোর কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়ে তোমাদের চোখে এসে পড়বে। এর ফলে ঐগুলি তোমরা দেখতে পাবে। এখন যদি টর্চটাকে চারদিকে ঘোরাও তবে চারদিকের বস্তুসমূহই তোমার চোখে পড়বে। আসলে র‍্যাডারের কর্মপদ্ধতিটাও একেবারেই এরকম। কেবলমাত্র যে পার্থক্য তা হল টর্চ থেকে আলোকতরঙ্গ ফেলা হয় কিন্তু র‍্যাডার থেকে ফেলা হয় বেতার তরঙ্গ। দৃশ্য আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল $\frac{1}{৫০০০০}$ ইঞ্চি কিন্তু র‍্যাডারের ব্যবহার উপযোগী বেতার তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রায় 4 ইঞ্চি। এই তরঙ্গগুলিকে বলে মাইক্রো-ওয়েভ্ (Micro-Wave)। এই তরঙ্গের একটা মস্ত সুবিধা হল এই যে আলোকতরঙ্গ মেঘ, কুয়াশা প্রভৃতি জিনিসগুলো ভেদ করতে না পারলেও র‍্যাডার তরঙ্গগুলি কিন্তু এই কার্য অতি সহজেই করতে পারে।

এখন দেখা যাক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এটার কাজ কেমন। মনে কর সমুদ্রের ওপর কোন একটা জাহাজ-এর ওপর র‍্যাডার বসানো আছে। ঐ র‍্যাডারের সাহায্যে আশেপাশের বস্তু সম্বন্ধে ধারণা করতে হবে। প্রথমে একটি অতি শক্তিশালী শর্ট-ওয়েভ রেডিও প্রেরকযন্ত্রের সাহায্যে মাইক্রোওয়েভ উৎপন্ন করা হবে এবং ঘূর্ণায়মান প্রেরক অ্যানটেনা ঐ তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। ঐ তরঙ্গ গিয়ে জাহাজ, দ্বীপ, স্থলভাগ প্রভৃতিকে গিয়ে আঘাত করে এবং প্রতিফলিত হয়ে র‍্যাডারেরর গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়ে।

[দমদম কৃষ্ণকুমার হিন্দু একাডেমির বিজ্ঞান বিভাগের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র]

৬৮, ডঃ মেঘনাদ সাহা রোড
কলকাতা-৭৪

প্রাণিকলা ঃ পেশী ও স্নায়ু

দিনোজকুমার দে

জীবনের লক্ষণগুলির মধ্যে চলন ও গমন অন্যতম। তাই প্রত্যেকটি সজীব বস্তুর ক্ষেত্রে চলন অথবা গমন দেখতে পাওয়া যায়। চলন সাধারণতঃ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য এবং গমন সাধারণতঃ প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য। চলন বলতে বোঝায় একই স্থানে স্থির থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন। আর গমন বলতে বোঝায় অঙ্গ-সঞ্চালনের দ্বারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া। দেখা যাচ্ছে গমনে অঙ্গ সঞ্চালন একান্ত প্রয়োজন। কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং সব মেরুদণ্ডী প্রাণী অঙ্গ সঞ্চালন করে পেশীকলার সাহায্যে। অর্থাৎ পেশীকলা বলতে বোঝায় সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা যে কলা দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটিয়ে থাকে।

মানুষের ত্বকের নিচে যে পুরু-ঈষৎ লাল রঙের স্তর দেখা যায় সেগুলিই পেশী। পেশীকেই চলতি কথায় বলে মাংস। একটি মানুষের দেহের মোট ওজনের প্রায় 40 শতাংশ পেশী। পেশীকলা পেশী-কোষ দ্বারা গঠিত। পেশী কোষগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান। যেমন পেশীকোষ উত্তেজনা গ্রহণ করে, উত্তেজনাকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চারিত করে, পেশীকোষ সংকুচিত ও প্রসারিত হয় ইত্যাদি। পেশীকোষ কয়েক প্রকার। প্রত্যেকের গঠন ও কার্য পৃথক। তাই গঠন ও কার্য অনুসারে পেশীকলাকে ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক এবং হৃৎপেশী এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ঐচ্ছিক পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। এই পেশীতে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত পর্যায়-ক্রমিকভাবে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রেখা দেখা যায়। সেইজন্যে ঐচ্ছিক পেশী সরেখ পেশী নামেও পরিচিত। আবার এই পেশী মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অস্থির সংগে যুক্ত থাকে বলে এই পেশীকে অস্থি-পেশীও বলে। ঐচ্ছিক পেশীর আদর্শ উদাহরণ হল হাতের বাইসেপস্ পেশী। পেশীকলা পেশীকোষ বা পেশীতন্তু দ্বারা গঠিত। পেশীতন্তুগুলি যথাক্রমে এপিমাইসিয়াম, পেরিমাইসিয়াম এবং এণ্ডোমাইসিয়াম নামক ত্রি-স্তরী আবরণ দ্বারা আবৃত। এই আবরণগুলি আবার অ্যারিওলার কলা দ্বারা তৈরি। পেশীতন্তুগুলি গুচ্ছাকারে থাকে। প্রতিগুচ্ছে প্রায় 12—16 টি পেশীতন্তু থাকে। এক-একটি গুচ্ছকে বলে ফ্যাসিকুলাস। প্রতিটি পেশীকোষ সারকোলেম্মা নামক পাতলা আবরণ দ্বারা আবৃত। কোষের ভিতরে মাইটোকনড্রিয়া ও গ্লাইকোজেন দানা যুক্ত সাইটোপ্লাজম বা সারকোপ্লাজম অবস্থিত। কোষে নিউক্লিয়াস থাকে এক বা একাধিক। সরেখপ্লাজমে লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত মায়োফাইব্রিল বা সূক্ষ্ম তন্তু দেখা যায়। মায়োফাইব্রিলগুলি মায়োসিন তন্তু ও অ্যাকটিন তন্তু নামক দুই প্রকার প্রোটিন দ্বারা গঠিত। মায়োফাইব্রিলে মোটা মায়োসিন তন্তুর উপস্থিতিতে গাঢ় দাগ অ্যানাইসোট্রোপিক রেখা বা A-ব্যান্ড এবং সরু অ্যাকটিন তন্তুর উপস্থিতিতে হাল্কা দানা আইসোট্রোপিক রেখা বা I-ব্যান্ড বর্তমান। এই পেশী প্রাণীর ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে গমনে ও অঙ্গ সঞ্চালনে সাহায্য করে।

অনৈচ্ছিক পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়। এই পেশীতে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ বা গাঢ় ও হাল্কা কোন দাগ দেখা যায় না। তাই এই পেশী অরেখ বা মসৃণ পেশী নামেও পরিচিত। আকৃতি ও গঠনের দিক দিয়ে অনৈচ্ছিক পেশী ঐচ্ছিক পেশী অপেক্ষা পৃথক। ঐনৈচ্ছিক পেশী দেখতে মাকুর মত অর্থাৎ দুই প্রান্ত সরু ও লম্বা এবং মাঝখান টা মোটা। এই পেশী কলার কোষের বাইরে কোন আবরণী নেই। এণ্ডোপ্লাজমীয় জালক, গলগিবডি ও মাইটোকনড্রিয়া সহ কোষে সারকোপ্লাজম বর্তমান। সারকোপ্লাজমে একটি মাত্র দণ্ডাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি নিউক্লিয়াস থাকে। ঐচ্ছিক পেশীর মত অনৈচ্ছিক পেশীতেও মায়োসিন ও অ্যাকটিন তন্তু দ্বারা তৈরি মায়োফাইব্রিল আছে। এই পেশীর কার্য স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। অনৈচ্ছিক পেশী রক্তনালীর প্রাচীরে, পৌষ্টিকনালীর বিভিন্ন অংশে, পিত্তথলি, মূত্রথলি এবং জরায়ু প্রভৃতি অংশে দেখা যায়।

গঠনের দিক দিয়ে সরেখ ও অরেখপেশীর সঙ্গে হৃৎপেশীর প্রচুর সাদৃশ্য থাকলেও হৃৎপেশীর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য হৃৎপেশী স্বতন্ত্রভাবে হৃৎপেশীকলা নামে পরিচিত। এই পেশীকলার কোষগুলি বা পেশী তন্তুগুলি শাখাবিশিষ্ট। অর্থাৎ একটি তন্তুর সারকোপ্লাজম শাখার সাহায্যে পাশের তন্তুর সারকোপ্লাজমের সঙ্গে যুক্ত। সংযোগস্থলে কোষপর্দা দ্বারা তৈরি চাকতি বা

ইণ্টার ক্যালেটেড ডিস্ক দেখা যায়। প্রতিটি পেশীকোষে একটি মাত্র নিউক্লিয়াস আছে। হৃৎপিণ্ড সংলগ্ন স্থানে ও হৃৎপিণ্ডে দেখা যায়। হৃৎপেশী হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণকে নিয়ন্ত্রণ করা, সংকোচনকে পরিবাহিত করা প্রভৃতি হৃৎপেশীর কাজ।

প্রাণীর গমনাগমন কেবলমাত্র পেশীকলার সাহায্যে ঘটে না। সাহায্য প্রয়োজন স্নায়ুকলার। স্নায়ুকলার কাজ কেবল গমনে সাহায্য করাই নয়। উত্তেজনা গ্রহণ করা, গৃহীত উত্তেজনাকে পরিবাহিত করা এবং আবেগে সাড়া দেওয়াও স্নায়ুকলার কাজ। স্নায়ুকলা স্নায়ুকোষ বা নিউরোন দ্বারা গঠিত। প্রতিটি স্নায়ুকোষ কোষদেহ, কৈশতন্তু বা ডেনড্রন ও অক্ষতন্তু বা অ্যাক্সন দ্বারা গঠিত। কোষদেহ কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম ও একটি বৃহদাকার নিউক্লিয়াস দ্বারা গঠিত। নিউরনের সাইটোপ্লাজম নিউরোপ্লাজম নামে পরিচিত। নিউরোপ্লাজমে নিস্‌লদানা, মাইটোকনড্রিয়া, গলাগবডি বর্তমান। এছাড়াও নিউরো-প্লাজমে মেলানিন ও লাইপোক্রোম নামক রঞ্জক পদার্থও দেখা যায়। নিউরোনে কিন্তু কোন সেণ্ট্রোজোম থাকে না। আর সেণ্ট্রোজোম থাকে না বলে স্নায়ুকোষ বা নিউরোন কখনও বিভাজিত হয় না। কোষদেহ থেকে বেশ কিছু শাখা-প্রশাখা বের হয়। শাখাগুলি কৈশতন্তু বা ডেনড্রন এবং প্রশাখাগুলি ডেনড্রাইট নামে পরিচিত। কোষদেহের মত ডেনড্রন ও ডেনড্রাইটে নিউরোনপর্দা, নিউরোপ্লাজমে ও নিসলদানা থাকে। কোষদেহ থেকে যে দীর্ঘ শাখা-প্রশাখাহীন প্রবর্ধক বের হয় তাকে বলে অক্ষতন্তু বা অ্যাক্সন। অ্যাক্সন, পাতলা পর্দা নিউরোলেম্মা দ্বারা আবৃত থাকে। নিউরোলেম্মার ভিতরে থাকে স্নেহজাতীয় পদার্থ নির্মিত আবরণ মায়োলিন শীথ বা মেডুলারী শীথ। মেডুলারী আবরণ মাঝে মাঝে ভাঙ্গা। ঐ ভাঙ্গা স্থানগুলিকে বলে র‍্যানভিয়ারের পর্ব। মেডুলারী আবরণে এক ধরনের কোষ দেখা যায়। কোষগুলি সোয়ান কোষ নামে পরিচিত। অ্যাক্সনের শেষপ্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখাগুলিকে বলে তন্তু-ব্রাশ।

মর্কট পুরাণ

সুন্দরবনের প্রান্তে এক বানর দলপতি মস্তবড় এক পাকুড় গাছের মগডালে বসে দলের অন্যান্যদের চালচলন লক্ষ্য করছিল। এক সময় দেখলে, সোনালী নামে এক বানরী তার স্বামী রুপোর গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের একটা চড় বসিয়ে দিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে খিঁচিয়ে উঠলে।

দলপতি গাছ থেকে নেমে সোজা ছুটে গেল দম্পতির কাছে। সোনালীর ঘাড়টা ধরে বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে বানরীয় ভাষায় বললে—এমন অসভ্যতা কোথা শিখলিরে সোনালী? মানুষের সমাজে গিয়েছিলি বুঝি?

রুপো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে—হুজুর সবজান্তা! সেদিন সোনালী বললে; শুনেছি, মানুষ জাতটা আমাদেরই দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ওরা নাকি বন কেটে নগর বসিয়েছে। একবার দেখে আসি, চল দিকিনি!

সন্ধ্যায় মা কালীর মন্দির প্রাঙ্গণে এক বিরাট বকুল গাছে আশ্রয় নিলাম।

—তারপর?

—সেদিন কী একটা ছিল। মন্দির প্রাঙ্গণ ছেয়ে গেল মানুষে মানুষে। তারপর বিরাট বিরাট ধুতুরা ফুলের মত দেখতে কী সব বাঁধলে এখানে ওখানে। অবশেষে সেইগুলো উগরাতে লাগল। বানর সমাজের ঝগড়াঝাটি এবং গলাবাজির মত হেঁড়ে ও মিহি গলার চেঁচামেচি, বোমও ফাটালে বেশ। ভোরের দিকে মন্দির ফাঁকা হয়ে যেতে নাক কান মলে একেবারে ভোঁ দৌড় দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

দলপতি বললে—হুঁ বুঝেছি! একটানা কানে ঝালাপালা শব্দে সোনালীর পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসৃত হয়ে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে ওর মনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে এবং সেই থেকে মাথার গোলমাল এসেছে।

রুপো বললে—মিথ্যে কথা। মানুষ জাতটা এত গোলমালেও মাথা ঠিক রেখেছে, আর একটা রাতে সোনালীর মাথা বিগড়ে গেল?

বিকৃত গলায় দলপতি বললে—ওদের মাথাগুলোও ঠিক নেই। শুধু আহাম্মুক মানুষরা বুঝতে পারছে না—এই যা।

একটু নীরব থেকে দলপতি পুনরায় বললে—সোনালীর বাচ্চারা বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে জন্মাবে এবং অদূর ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে এক উচ্ছৃংখল ও অবিবেচক বানর সমাজের।

কপিঞ্জল শর্মা

ডিটারজেণ্ট

মিলন গঙ্গোপাধ্যায়

এপর্যন্ত অনেক কিছুই আবিষ্কৃত হয়েছে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে। তেমন একদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্যে মানুষ তার পরিবেশের মধ্যে হাতড়াচ্ছিল। আমরা যদি কল্পনা করি ; সেই আদিম যুগে একদল মানুষ শিকারের পর মাংস সেঁকছিল আগুনে, এমন সময় গরম মাংস থেকে চর্বি গলে পড়লো ছাইয়ে। একসময় খাওয়া দাওয়ার পর হাত ধোয়ার আগে আদিম মানুষ দুহাতে সেই ছাই মেখে ডলতে লাগলো। অবাক কাণ্ড! হাত ধোয়ার পর দেখা গেল, অনেক বেশি পরিষ্কাব। তবুও মানুষ জানলো না চর্বির জন্য হাত অত বেশি পরিষ্কার হয়েছে।

এদিকে, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ইত্যাদি যেমন ছিল অত্যাবশ্যক, সাবান প্রস্তুতও তেমনি জরুরী ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষগণ ক্রমশ অভিজ্ঞতায় জানলো চর্বি দিয়ে পরিষ্কারক বা সাবান তৈরি করা সম্ভব। মানুষের তৈরি সফল কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে সাবান সম্ভবত সব.চেয়ে আগে প্রস্তুত হয়েছিল। সাবান আবিষ্কৃত হয় বহু বহু বছর আগে। এবং তার ব্যবহার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে আরও সহজ এবং আরও উৎকৃষ্ট কিছুর অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষ কৃত্রিম পরিষ্কারক বা সাবানহীন সাবান আবিষ্কার করল। যাকে আমরা বলি ডিটারজেণ্ট। অন্য যে কোন সাবানের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী এবং বহুমুখী ব্যবহার্য।

সাবানের কাজ যেমন পরিষ্কার করা, ডিটারজেণ্টের কাজও তাই। কিন্তু সাবান প্রস্তুত হয় প্রধানত চর্বি ও বনস্পতি তেল থেকে আর সিন্থেটিক ডিটারজেণ্ট তৈরি হয় পেট্রোলিয়ামের উপজাত থেকে। তাই সাবান ও ডিটার-জেণ্টের অণুগুলি পৃথক পৃথক আচরণ করে। আবার ডিটারজেণ্টের অণুগুলিও পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে। যেমন কোন কাপড় কাচবার সময় তাতে ধুলো-ময়লা যেমন থাকে তেল-কালিও থাকে। একদল অণু তেল-চর্বি মাখা ময়লা দূর করার কাজে লেগে যায় অপরদল সাধারণ ময়লা দূর করার কাজে লেগে যায়। অণুগুলির এই যোথ লড়াইয়ের ফলে তেল-কালি,, ধুলো-ময়লা কাপড় থেকে দূর হয়ে জলের মধ্যে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু এই ময়লার টুকরো যাতে পরস্পর দলা পাকিয়ে না যায় তার জন্য এক অদৃশ্য আস্তরণ সৃষ্টি করে।

মানুষের উপকারী হাতিয়ার হিসেবে এই শতাব্দীতে ডিটারজেণ্টের ভূমিকার সঙ্গে সাবানের তুলনা করলে দেখা যায় সাবানের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা। যেমন সাবানের ফেনা হতে অনেক সময় লাগে এবং ঠাণ্ডা জলে বা ক্ষারজলে, লবণাক্ত জলে বা অম্লজলে সাবানের ফেনা হওয়া দুঃসাধ্য। ক্ষারজলে কাপড় কাচার সময় জলে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থের সংস্পর্শে এসে সাবানের ফেনা কোন জিনিসকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করতে পারে না। এই ফেনার দাগ কাপড়ের গায়ে বা অন্য কোন জিনিসের গায়ে লেগে থাকে কিন্তু ডিটারজেণ্টের ক্ষেত্রে তা হয় না। ডিটারজেণ্ট যে কোন জলে স্বাভাবিক কাজ করে কারণ এর অণুগুলির জলে মিশ্রিত খনিজ পদার্থের সঙ্গে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে না।

সাবানের ব্যবহার শুধুমাত্র কাপড় কাচা ও গায়ে মাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু ডিটারজেণ্টের ব্যবহার বহুমুখী। কয়েকটা নমুনা দিলেই বুঝতে পারবে। বাসনপত্র কাপ-ডিস ইত্যাদি পরিষ্কার করবার জন্য ডিটারজেণ্টের ব্যবহার আজ ঘরে ঘরে। এতে ফেনা কম হয় অথচ বাসন-পত্র ঝকমক করে। শহরের রাস্তাঘাট, রেলস্তরে লোকমোটিভস্ ইত্যাদি পরিচ্ছন্নতার জন্য ডিটারজেণ্ট ব্যবহৃত হয়। হ্যাণ্ডলোশন ও ওষুধপত্রে ডিটারজেণ্টের ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে কোন গ্যাজা বা ফেনা হয় না।

আবার যে সমস্ত ডিটারজেণ্টে প্রচুর ফেনা হয় তা দিয়ে তৈরি হয় শ্যাম্পু।

ঘরের মেঝে ও দেওয়ালে ব্যবহৃত হয় সিন্থেটিক ডিটার-জেণ্টের নানা আস্তরণ। এর ফলে ঘন ঘন সাফাই করতে হয় না, দাগও ধরে না।

ডিটারজেণ্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল শুধু পরিষ্কার করা নয় রোগজীবাণু ধ্বংস করার কাজে অ্যামোনিয়াম যৌগ হিসেবে হাসপাতালে সার্জেনের হাত পরিচ্ছন্ন রাখা থেকে রোগীর ত্বক জীবাণুমুক্ত করা। এই যৌগ যখন আবিষ্কৃত হয়নি তখন ডাক্তাররা হাতের রোগজীবাণু ধ্বংস করার জন্য বারবার সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতেন। এখন তা মুহূর্তেই সম্পন্ন হয়।

দুধের মধ্যে ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করার কাজেও এই যৌগ ব্যবহৃত হয়। যে কারণে ডেয়ারী শিল্পে এর ব্যাপক ব্যবহার। অথচ এই যৌগ মিশ্রণে দুধের স্বাদ ও গন্ধের কোন তারতম্য ঘটায় না।

পানীয় জলও জীবাণুমুক্ত করা যায় এই যৌগ দ্বারা। খুব সামান্য সলিউশন দ্বারা পানীয়জলের মধ্যেকার ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়া সহজেই ধ্বংস হয় অথচ মানুষের কোন ক্ষতি হয় না।

আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

রাজা মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষের মনে জেগে উঠছে অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার এক অদম্য বাসনা। এই অদম্য বাসনার ফলস্বরূপ হয়েছে নানা আবিষ্কার—বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক। সেই সব অসংখ্য আবিষ্কারের মধ্যে আমি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা বলছি।

সোডিয়াম ক্লোরাইড (Nacl) বা সাধারণ লবণ আমরা নিত্যই গ্রহণ করছি। এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের সোডিয়াম (Na) আবিষ্কৃত হয় 1807 খ্রীঃ। সোডিয়ামের পরমাণু ক্রমাঙ্ক 11, যোজ্যতা 1 এবং পারমাণবিক গুরুত্ব 22.997। সোডিয়াম আবিষ্কার করেন স্যর হামফ্রে ডেভি। ঐ বছরই তিনি আবিষ্কার করেন পটাশিয়াম (k)। পটাশিয়ামের পরমাণু ক্রমাঙ্ক 19, যোজ্যতা 1 এবং পারমাণবিক গুরুত্ব 39.096। পর বৎসর অর্থাৎ 1803 খ্রীঃ ডেভি আবিষ্কার করেন ম্যাগনেসিয়াম (Mg) এবং ক্যালসিয়াম (Ca)। ম্যাগনেসিয়ামের পরমাণু ক্রমাঙ্ক 12, যোজ্যতা 2 এবং পারমাণবিক গুরুত্ব 24.32। ক্যালসিয়ামের পরমাণু ক্রমাঙ্ক 20, যোজ্যতা 2 এবং পারমাণবিক গুরুত্ব 40.08। পরীক্ষাগারে যে গ্যাস বার্নার বা বুনসেন বার্নার ব্যবহৃত হয়, সেইটি আবিষ্কার করেন রবার্ট ভিল হেমভন বুনসেন। বুনসেন জার্মানীর বাসিন্দা। সিনেমার প্রোজেক্টর তো সবাই দেখেছ। সিনেমার প্রোজেক্টরে যে শক্তিশালী আলো ব্যবহৃত হয় তাতে একজোড়া কার্বন দণ্ডের মাঝখানে আলো উৎপন্ন হয়, একে বলা হয় আর্ক ল্যাম্প (Arc-Lamp)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সি এফ. ব্রুশ 1879 খ্রীষ্টাব্দের 29 শে এপ্রিল আবিষ্কার করেন আর্ক-ল্যাম্প। আজকাল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই পরীক্ষার পর টাইপ শর্টহ্যান্ড শেখে। ইংল্যান্ডের অধিবাসী আইজ্যাক পিটম্যান 1837 খ্রীঃ আবিষ্কার করেন শর্টহ্যান্ড লিখন। আমেরিকার অধিবাসী সোমস্ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় টাইপরাইটার। আমরা তো চশমা পরি। 1816 খ্রীঃ ইতালীয় স্পিনা আবিষ্কার করেন চশমা। ক্যামেরা আমাদের জীবনযাত্রার একটি প্রধান সঙ্গী। অতীতের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার স্মৃতি জড়ানো দিনগুলি তুলে ধরে আমাদের দৃশ্যপটে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইস্টম্যান কোডাক 1888 খ্রীঃ আবিষ্কার করেন ক্যামেরা।

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

ডিসেম্বর সংখ্যার সিনিয়র ও জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

অমরনাথ রায়ের
সংখ্যা নিয়ে খেলা

ডিসেম্বর সংখ্যার জুনিয়র ও সিনিয়র ফটো ক্যুইজের উপহার

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা

বিঃ দ্রঃ অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যার সিনিয়র, জুনিয়র ও ফোটো ক্যুইজের সফল প্রতিযোগীদের উপহার স্বরূপ দেয় গ্রন্থের নাম ভ্রমবশতঃ ঘোষণা করা হয়নি। উক্ত সংখ্যার সিনিয়র জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ও ফটো ক্যুইজের উপহার ঃ পার্থসারথি চক্রবর্তীর মাটি থেকে আকাশে ও সমরজিৎ করের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী।

প্রতিযোগিতার কুপন

সিনিয়র/জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট, আই কিউ টেস্ট, এবং ফোটো ক্যুইজ-এর উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি .....

বয়স ..... শ্রেণী .....

বিদ্যালয়ের নাম .....

আই কিউ টেস্ট/সিনিয়র/জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ফোটো ক্যুইজ-এর উত্তর পাঠালাম।

পত্রমঞ্জরী

এণাক্ষী বিশ্বাস

বাগানবিলাসীদের কাছে পত্রমঞ্জরী নামটি খুবই পরিচিত। ইংরাজীতে পয়েনসেটিয়া ও ক্রীস্টমাস প্লাওয়ার নামে পরিচিত। কারণ প্রভু যীশু খ্রীস্টের যে মাসে জন্ম অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে এই ফুলের লাল মঞ্জরী পত্রগুলির রঙ টকটকে লাল হয়। (এখানে ছবিটি ফেব্রুয়ারী মাসে তোলা)। তাই ইংরাজীতে এই ফুলের অপর নাম ক্রীস্টমাস ফ্লাওয়ার। বাংলায় পত্রমঞ্জরী ও কেরই নামে পরিচিত।

প্রথমে এই সৌখিন ফুল গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম ছিল পয়েনসেটিয়া পালচেরিমা। সর্বপ্রথম 1828 সালে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী গ্রাহাম এই সৌখিন গুল্মটিকে মেক্সিকোতে আবিষ্কার করেন এবং বৈজ্ঞানিক বর্ণনা করে নামকরণ করেন পয়েনসেটিয়া পালচেরিমা। পরবর্তীকালে এই নাম পরিবর্তিত হয়ে ইউফরবিয়া পালচেরিমা হয়। ল্যাটিন ভাষায় পালচেরিমা কথার অর্থ খুব সুন্দর। কার্যত দেখা যায় টকটকে লাল রঙের পত্রমঞ্জরীগুলি এই উদ্ভিদের প্রধান আকর্ষণ এবং সহজেই বহুদূর থেকেই নয়ন মনো-মুগ্ধকর শোভা বিস্তার করে। এর আদিনিবাস মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকাতে। ইউফোরবিয়েসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর কয়েকটি ভ্যারাইটি আছে। যেমন, মঞ্জরীপত্র সাদা, গোলাপী, হলুদ রঙের হয়। সেগুলি লাল মঞ্জরীপত্রের মত অত আকর্ষণীয় হয় না। তারপর কখনও কখনও এক সারিতে আবার কখনও কখনও দুসারিতে মঞ্জরীপত্র থাকে।

এবার ফুলের কথায় বলি, ফুল খুবই নগণ্য। অনেকেরই ভুল ধারণা যে এই টকটকে লাল রঙের মঞ্জরীপত্র-গুলি নিশ্চয় ফুলের দলমণ্ডল। কিন্তু তা নয়। প্রতি শাখার প্রান্তে লাল রঙের বড় বড় মঞ্জরীপত্র হয়। তার ওপরে ফুল হয়। এই ফুলের পুষ্পবিন্যাস বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই বিশেষ ধরনের পুষ্পবিন্যাসকে সায়াথিয়াম বলে। ফুলগুলি অসম্পূর্ণ, এর বৃতি ও দলমণ্ডল থাকে না। একটি কাপের আকৃতিবিশিষ্ট সবুজ রঙের উপাবরণ থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উপাবরণের গায়ে উঁচু হলুদ রঙের গ্রন্থি আছে। একে ইংরাজীতে নেকটার গ্ল্যান্ড বলে।

এই উপাবরণটি বৃন্তযুক্ত। এই উপাবরণটির নিচের তিন চতুর্থাংশ সবুজ রঙ, ওপরের দিকে এক চতুর্থাংশ হলুদ রঙ এবং মুখের কাছের রঙ লাল হয়। মুখের ভেতরের দিকে সিল্কের মত নরম সূক্ষ্ম বহুকোষ বিশিষ্ট রোম দ্বারা আবৃত থাকে। এই উপাবরণের মধ্যে স্ত্রী ও পুং পুষ্প থাকে। এই পুষ্পগুলিকে পুষ্পিকা বলে। সবচেয়ে লম্বা ফুলটি স্ত্রী পুষ্পিকা আবার একাধিক স্ত্রী পুষ্পিকা বা একাধিক নিষ্ফলা স্ত্রী পুষ্পিকার সমাবেশ হতে পারে। স্ত্রী পুষ্পিকার চতুর্দিকে অনেক পুংপুষ্পিকা থাকে। এই পুংপুষ্পিকা লেন্সের নিচে রেখে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে একটি বৃন্তযুক্ত পুংদণ্ড, এক কোষ যুক্ত দুটি পরাগকোষ। এর মধ্যে নিষ্ফলা পুংপুষ্পিকাও থাকে। এই ধরনের নিষ্ফলা পুংপুষ্পিকাতে পরাগকোষের পরিবর্তে পুংদণ্ডের মাথাটি লাল হয় ও বহুকোষবিশিষ্ট রোম দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। (ফটো ঃ সুবক্ষকৃষ্ণ দে)

পিয়ানো আবিষ্কারের গল্প

জিজার আজ খুব মন খারাপ। দিদি আজ প্রথম পিয়ানো ক্লাসে গিয়েছিল। ফিরে এসে জিজাকে টেক্কা দিয়ে দিয়ে খুব গল্প বলেছে। জিজা বেচারা মুখ চুন করে আমার কাছে এল। কি করে দিদির ওপর এক হাত নেওয়া যায়, সেই পরামর্শ করতে। অনেক ভেবে বললুম, এক কাজ কর, দিদি নিশ্চয়ই পিয়ানো আবিষ্কারের গল্প জানে না। তুমি সেটা শুনে নিয়ে দিদিকে বলে তাক লাগিয়ে দাও। জিজা খুব খুশি, মাথা দুলিয়ে বলল, 'বল কাকু।

'বার্তোলোমিও ক্রিস্তোফোরি প্রথম পিয়ানো আবিষ্কার করেন। পিয়ানোর আগে যা যা বাদ্যযন্ত্র ছিল তাকে বলা হত ক্লেভিকর্ড বা হার্পসিকর্ড। তবে এই যন্ত্রের অসুবিধে ছিল একটা, এতে করে আওয়াজ মৃদু বা জোরালো করবার উপায় ছিল না। সব সময় একই রকম আওয়াজ হত। 1709 খ্রীষ্টাব্দে ক্রিস্তোফোরি আওয়াজ জোরালো বা মৃদু করবার উপায় বের করলেন। তারপরেই ধীরে ধীরে পিয়ানোর জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল। এবং কালে কালে পিয়ানো সব থেকে জনপ্রিয় বাজনা হয়ে উঠল।

পিয়ানো হল আসলে একটা বিরাট বাক্স, বাইরে কতগুলো ঘাট আর ভিতরে কতগুলো তার। যে তারগুলো লম্বা সেগুলো চড়া সুরের জন্য, আর ছোট তারগুলো দিয়ে খাদের সুর বাজানো হয়। এই তারের সারিগুলোর তলায় একটা কাঠের টুকরো লাগানো। তাকে বলা হয় সাউণ্ডিং। তারের সঙ্গে বোর্ডটাও নড়ে আর আওয়াজও আরও বেশি হয়।'

'তবে এবার দিদিকে চটপট এগুলো বলে ফেল, দেখ, দিদি কেমন বোকা বনে যায়।'

জিজার তবু যাবার ইচ্ছে নেই, জিগ্যেস করলুম, 'কি হল'। পাংশু মুখে জিজা বলল 'আরেকবার বলবে কাকু, সব ভুলে গেছি।'

অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ

চেনা-অচেনা জীবজন্তু

ডিঙ্গো

অমরনাথ রায়

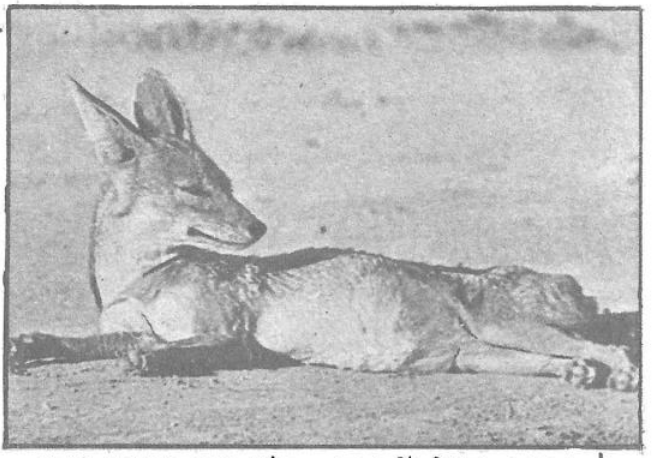

রঙীন ছবিটা দেখে কি মনে হচ্ছে বল তো? একটা কুকুর শুয়ে আছে, তাই না? হ্যাঁ, তোমার অনুমান ঠিকই। তবে কুকুরটা আমাদের দেশের নয়—অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের এবং পোষা কুকুর নয়, বুনো কুকুর। নাম ডিঙ্গো। ডিঙ্গোর মাথাটি লম্বাটে ধরনের এবং চ্যাপ্টা। দেহ লোমশ এবং লোমগুলি বেশ নরম। গায়ের রং সাধারণত সোনালি হলদে, খাড়া কানের আগা দুটি ছুঁচলো এবং লোমশ, লেজের আগাটি সাদা রঙের। ডিঙ্গোর পেশীবহুল সুগঠিত দেহ দেখে মানুষেরও ভয় হয়। একসঙ্গে দুটি বা তিনটি ডিঙ্গো দল বেঁধে শিকারে বেরোয়। এদের শিকারের মধ্যে প্রধান হলো ভেড়া ও ক্যাঙারু। ভূগোল বইতে তোমরা পড়েছ যে অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডে প্রচুর পশুচারণ ক্ষেত্র আছে। সেখানে ভেড়া প্রতিপালন করা হয়, কিন্তু ডিঙ্গোদের উৎপাতে ভেড়া রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। এক একটি ডিঙ্গো এক রাতে অনেকগুলি ভেড়া খুন করে পালিয়ে যায়। তাই বহু অর্থ ব্যয় করে কয়েক বছর আগে কুইন্সল্যাণ্ডের প্রায় সাড়ে তেরো কোটি একর জমি ঘিরে রাখার জন্যে সাড়ে তিন হাজার মাইল লম্বা ও বেশ উঁচু বেড়া তৈরি করা হয়েছে। আট বছর সময় লাগে ঐ বেড়া তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করতে। শোনা যায়, এটি নাকি পৃথিবীর দীর্ঘতম বেড়া। পারতো—সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করো।

ভূগর্ভের সম্পদ

মাস্কোভাইট

মস্কোর অধিবাসীদের কথা বলছি না কিন্তু, বলছি একটি খনিজের কথা, নাম যার 'মাস্কোভাইট'। সাদা বাংলায় এটা এক ধরনের সাদা অভ্র, যাতে পটাসিয়াম থাকে। এর রাসায়নিক সংকেত হলো $KAl_3 Si_3 O_{10} (OH)_2$। এই খনিজটির একটি বিশেষ গুণ হল, এটি একাধারে স্থিতিস্থাপক, শক্ত, নমনীয়, স্বচ্ছ, তাপ নিরোধক ও উচ্চ ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবক সম্পন্ন। খুব পাতলা পাতলা স্তরে একে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। মোজ (Moh's) স্কেলে এর কাঠিন্য মাত্র 2.5. এই জাতীয় অভ্রকে আমরা কেলাসরূপে পাই। কেলাস বিদ্যায় এরা মনোক্লিনিক শ্রেণীভুক্ত। এই জাতের অভ্র সাধারণত বর্ণহীন হয়, তবে অশুদ্ধি থাকলে রঙীনও হয়ে থাকে। বৈদ্যুতিক ক্যাপসিটার (Capacitor) তৈরিতে, অন্তরক তৈরিতে ও আরও অনেক কাজে এই খনিজটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মাস্কোভাইট শ্রেণীর অভ্র বিভিন্ন ধরনের শিলাতে হামেশাই দেখা যায়। তবে বিভিন্ন ফিলাইট, সিস্ট ও নাইস জাতীয় শিলায় বেশি পাওয়া যায়। শিল্পে ব্যবহারোপযোগী অভ্র কিন্তু সংগৃহীত হয় আগ্নিক পেগমাটাইট থেকে, বিশালকায় কেলাসরূপে, যা সাধারণত 'বুক মাইকা' নামে জনপ্রিয়। আমাদের ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এক নম্বর অভ্র উৎপাদনকারী দেশ। বুক মাইকার বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য আমাদের দেশেরই। আমাদের দেশে বিহার (শতকরা 50 ভাগেরও বেশি), রাজস্থান ও অন্ধ্রপ্রদেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মাস্কোভাইট পাওয়া যায়। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রাজিল, গ্রীনল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও এই শ্রেণীর খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের নেলোরে পাওয়া একটি মাস্কোভাইট অভ্রের কেলাস দৈর্ঘ্যে পনের ফিট, দশ ফুট ব্যাসযুক্ত ও পঁচাশি টন ওজনের ছিল। ভাবলেও অবাক হতে হয়! তাই নাকি?

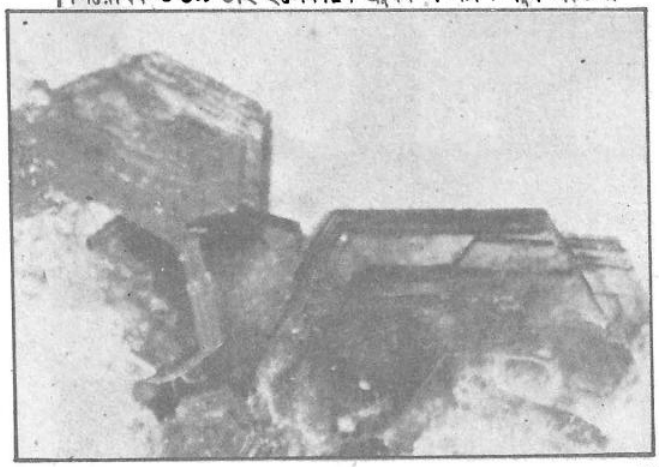

জুনিয়র
ক্যুইজ কনটেস্ট

মান : VI—VIII ডিসেম্বর 1986

1. আখের চিনির মধ্যে কি কি মৌল উপাদান আছে ?
2. বাণভট্ট কে ছিলেন ?
3. মহামীর কোথায় দেহত্যাগ করেন ?
4. সুদানের উত্তরে কোন্ মরুভূমি আছে ?
5. কলকাতা শহরে ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ?
6. ব্রডগেজ রেলপথ কত মিটার চওড়া হয় ?
7. সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় আজ পর্যন্ত ভারতে কটি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়েছে ?
8. কানপুরের 'গ্রীন পার্ক" এর নাম কোন্ খেলার সঙ্গে জড়িত ?
9. 'সাউপাউলা' কোথায় ও কি জন্য বিখ্যাত ?
10. আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর 'মীনাম্বকম' ভারতের কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?

সেপ্টেম্বর 86 সংখ্যায় প্রকাশিত

জুনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট'-এর সমাধান।

1. কলম্বো লিভিয়া। 2. পল্লবরাজ। 3. মৃতের নগরী। 4. শিল্পী ফিডিয়াস। 5. বেদুইন। 6 জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর। 7. ডক্টর মেঘনাদ সাহা। 8. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। 9. কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস। 10. (গ) চন্দ্র। 11. 21শে জুন তারিখে।

সেপ্টেম্বর '86তে প্রকাশিত
জুনিয়ার ফোটো ক্যুইজের সমাধান।
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

সেপ্টেম্বরে '86 তে প্রকাশিত আই-কিউ টেস্ট-এর সমাধান

1. (a) আমেরিকান, (b) চীনা, (c) ব্রিটিশ, (d) ফরাসী, (e) জার্মান, (f) ভারতীয়, (g) জার্মান, (h) ইরানী, (i) ফরাসী।
2. (a) তাঁরা রোজ টাটকা খবরগুলি জানতে চান।
3. (b) উপকার।
4. (c) বিশুদ্ধ জলের কম সংখ্যক অণু আয়নিত হয়।
5. (c) 15 জন।

জুনিয়র
ফটো ক্যুইজ

ভারতবর্ষে অবস্থিত একটি বিখ্যাত মন্দির। সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। এই মন্দিরের সঙ্গে আষাঢ় মাসের একটি সম্পর্কও আছে। ভেবে বল দেখি মন্দিরটার নাম কি ?

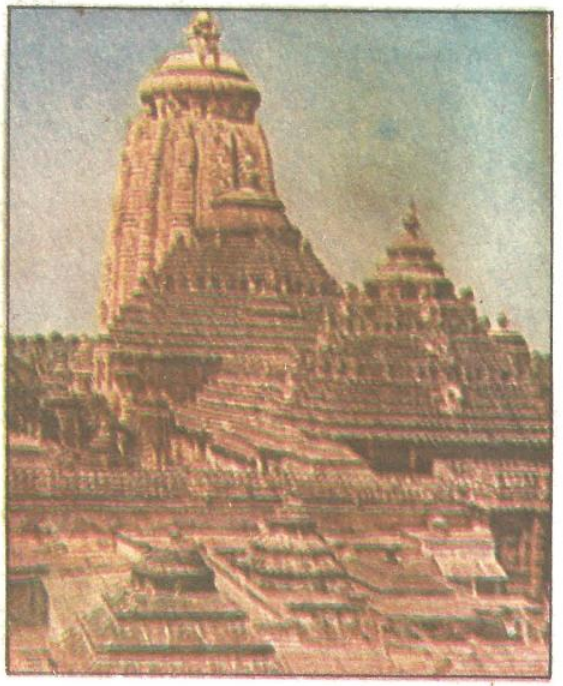

গত সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান

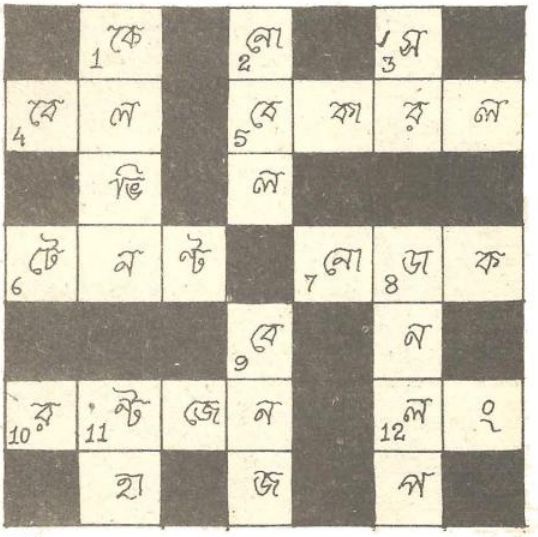

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পুজো সংখ্যা' 86-এ প্রকাশিত 'সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট'-এর ফলাফল বের হলো। যারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র পাঠাতে পেরেছে শুধু তাদের উত্তরপত্রই বিবেচিত হয়েছে। ফলাফলের ভিত্তিতে পুরস্কারের অর্থমূল্য সমান ভাগে ভাগ করা হবে।

প্রথম পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঃ (সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা)

1. **জয়ন্ত ধর**। প্রযত্নে, গোপীনাথ ধর
15, উমাচরণ মিত্র লেন, কলকাতা-700003
2. **তরুণতপন গোরাই**। প্রযত্নে, শরৎকুমার গরাই, গুসকরা, সাহেব বাগান, বর্ধমান
3. **সুব্রতেশ রায়**। প্রযত্নে, সুধীরকুমার রায় ইন্দা (টায়ার হাউসের কাছে), পোস্ট—খড়্গপুর, মেদিনীপুর
4. **সৌমেন ভৌমিক**। প্রযত্নে, পঞ্চানন ভৌমিক 102, কালি বাড়ি, ফার্স্ট লেন, পোঃ—নিউ ব্যারাকপুর, 24-পরগনা

দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঃ
(19টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে)

1. **সব্যসাচী ভট্টাচার্য**। প্রযত্নে, সমীরনাথ ভট্টাচার্য গ্রাম—হরিনাভি, পোঃ—হরিনাভি, 19।1, আর. এন. টি. রোড, দক্ষিণ 24-পরগনা
2. **রাজর্ষি সেনগুপ্ত**। ব্লক—12, ফ্ল্যাট-2 রিজেন্ট পার্ক গভঃ এস্টেট, কলকাতা-700080
3. **ধ্রুবদাস মহলানবীশ**। প্রযত্নে, নির্মল মুখার্জ্জী 37, হরেন মুখার্জ্জী রোড, হাকিমপাড়া, পোঃ—শিলিগুড়ি, দার্জিলিং
4. **পার্থ দাস**
18 B, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-700004
5. **আশিস মণ্ডল**। প্রযত্নে, আনন্দ মণ্ডল পোঃ+গ্রাম—পাটুলি স্টেশন বাজার, বর্ধমান-713512
6. **ধীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**। প্রযত্নে, সুশীল মুখোপাধ্যায়, গ্রাম—রামনগর, পোঃ—দীঘা, মেদিনীপুর
7. **দিলীপ দাস**। প্রযত্নে, করুণাময় দাস গ্রাম—উট পাথর, পোঃ—নিমপুরা, মেদিনীপুর

তৃতীয় পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঃ
(18টি প্রশ্নেরসঠিক উত্তর দিয়েছে)

1. **দীপককুমার ষড়ঙ্গী**। প্রযত্নে, এস. এস. ষড়ঙ্গী পোঃ—কাঁথি, মেদিনীপুর
2. **সৌগত মাইতি**। প্রযত্নে, মহাদেবপ্রিয় মুখার্জী চুঁয়াপুর, বিবেকানন্দ পল্লী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-742101
3. **সন্দীপ মণ্ডল**। প্রযত্নে, গোলকবিহারী মণ্ডল দণ্ডপাণিওলা, নবদ্বীপ, নদীয়া
4. **মনোজিৎ দত্ত**। প্রযত্নে, রঞ্জিত দত্ত 2nd বিল্ডিং, ফ্ল্যাট-9, সেকেণ্ড ফ্লোর, পোঃ—হুগলী, জেঃ হুগলী
5. **অরিন্দম দে** ৩৪।7A, বি. টি. রোড, ফ্ল্যাট—C।2, কলকাতা-700002
6. **সাগরময় গরাই**। প্রযত্নে, বিজয়কুমার গরাই পোঃ+গ্রাম - ভেদিয়া, বর্ধমান—713126
7. **অভীক চক্রবর্তী**। প্রযত্নে, বঙ্কিম চক্রবর্তী 268, টাকি রোড (নর্থ), পোঃ—কাজিপাড়া, 24-পরগনা-743201
8. **রুনু নিয়োগী**। প্রযত্নে, রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী গ্রাম—পানপুর, পোঃ—নারায়ণপুর, মাধ্যম-কাঁকিনাড়া, উত্তর 24-পরগনা-743126
9. **শান্তনু দাস**। প্রযত্নে, আর. এন. দাস গ্রাম—সুদর্শনপুর, পোঃ রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর
10. **কুশকুমার বেহেরা**। প্রযত্নে, গুণনিধি বেহেরা 16, হরলাল মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-700003
11. **চৈতালী কুণ্ডু**। প্রযত্নে, চণ্ডীচরণ কুণ্ডু গ্রাম+পোঃ—কুলটিকরী, মেদিনীপুর-721135
12. **পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী**।
4H, বৈষ্ণবঘাটা বাইলেন, কলকাতা-700047
13. **শিপ্রা পাল**। প্রযত্নে, স্নেহাংশু পাল পোঃ—চাকদহ (নেতাজী পার্ক), নদীয়া
14. **সৌমেন মণ্ডল**। প্রযত্নে, অক্ষয়কুমার মণ্ডল 130A, অমরেন্দ্র সরণী, পোঃ—উত্তরপাড়া, হুগলী
15. **শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য**। প্রযত্নে, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য জোড়াঘাট লেন, চুঁচুড়া, হুগলী
16. **অর্কজ্যোতি মিশ্র**। প্রযত্নে, নিখিলেশ্বর মিশ্র 125, অখিল মিস্ত্রি লেন, কলকাতা-700009
17. **গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়**।
101/1, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া-1
18. **সৌমেন চৌধুরী**
5/2, লক্ষ্মণ দাস লেন, হাওড়া

সেপ্টেম্বর '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সব কটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিন জন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **সৌমেন মণ্ডল ঃ** প্রযত্নে, চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, ডোভার লেন এক্সটেনসন, ব্লক-2, রুম নং-K-1, কলকাতা-29।
2. **মহুয়া ঘোষ ঃ** 1/1B, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-700 058।
3. **অপর্ণা বিশ্বাস ঃ** প্রযত্নে, সূর্যকান্ড বিশ্বাস, গ্রাম—জগৎবল্লভপুর, পোস্ট—জগৎবল্লভপুর, জেলা—হাওড়া।

সেপ্টেম্বর '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সব কটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে।

কলকাতা ঃ জয়ন্ত ধর, রাজা ভট্টাচার্য, অপর্ণা চক্রবর্তী, নিতাই বসাক, রাজর্ষি সেনগুপ্ত, সৌরভ বসু, পার্থ প্রতিম চট্টোপাধ্যায়, রাজর্ষি পাল মজুমদার, বাণীকুমার মাইতি।

24-পরগণা ঃ দেবাশীষ রায়, তপনকুমার মণ্ডল, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, জয়ন্তী মিত্র, অর্ণব রায় চৌধুরী, অঞ্জন সেনগুপ্ত, শুভজ্যোতি চক্রবর্তী, পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য্য, অরিন্দম দাসমাজী, সুখেন্দু বিশ্বাস, অনিন্দ্য দে, সুজাতা ঘোষ, সুদীপ কুমার ময়রা।

হাওড়া ঃ অসীমকুমার সাহু, শরদিন্দু ভাদুড়ী, পল্লব ব্যানার্জী, বর্ণালী সামন্ত, সুশ্রুত সামন্ত, অয়ন চৌধুরী।

হুগলী ঃ মহুয়া গোস্বামী, মানস গোস্বামী, শুভঙ্কর বিশ্বাস, কৌশিক রায়, সৌমেন নন্দী।

বর্ধমান ঃ শ্রীরূপা ধর, অণিমা মুখার্জী, দীপঙ্কর দে, কৃষ্ণা দে, শম্পা কিস্কু, শ্যামশ্রী ব্যানার্জী, সুকান্ত তলাপাত্র, বিপ্লব মণ্ডল, শাশ্বতী ঘোষ, তরুণতপন গরাই।

মেদিনীপুর ঃ চিন্ময় মাহাতো, সৌরভ ভুঁঞা, সন্দীপন দাস, জয়ন্ত দত্ত মজুমদার, সত্যনারায়ণ বারিক, অপূর্ব কুমার সামন্ত, পুলক প্রধান, শাশ্বতী পাইক, সোমনাথ কুণ্ডু, রবীন্দ্রনাথ হাজরা।

নদীয়া ঃ ছন্দোময় মণ্ডল, প্রিয়ব্রত বিশ্বাস, অরবিন্দ বিশ্বাস, মৈত্রেয় মণ্ডল, অচিন্ত্য কুমার বিশ্বাস, বিশ্বনাথ তপাদার, মনোজ আগরওয়ালা, রজত কান্তি বিশ্বাস, রূপক কান্তি বিশ্বাস।

মুর্শিদাবাদ ঃ রফিকুজ্জমান। **বাঁকুড়া ঃ** শুদ্ধ কল্যাণ পাল, রূপাঞ্জন সাহা, চন্দন চক্রবর্তী।

মালদহ ঃ শান্তনু সিংহরায়, উজ্জ্বল কর্মকার। **পঃ দিনাজপুর ঃ** রাজু সরকার।

কুচবিহার ঃ রথীন্দ্রনাথ হিসাবিয়া। **দার্জিলিঙ্ ঃ** ধ্রুবদাস মহলানবীশ।

সেপ্টেম্বর '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফোটো ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিন জন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **স্বস্তিকা বিত্যান্ত ঃ** প্রযত্নে, নীহার কুমার বিদ্যান্ত, কুটিরপাড়া, শান্তিপুর, নদীয়া।
2. **অমিতাভ চ্যাটার্জী ঃ** 1/1D, গোয়াবাগান লেন, কলকাতা-700 006।
3. **দেবাশিস রায় ঃ** প্রযত্নে, দীপক রায়, পোস্ট—রহড়া, উত্তরপাড়া, উত্তর 24-পরগনা-743186।

সেপ্টেম্বর '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফোটো ক্যুইজ কনটেস্ট এ সঠিক আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ শেলী ভট্টাচার্য, সুদীপ পাল, দেবলীনা রায়, সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীষ রায়, চিত্তরঞ্জন দাস, দীপাংশু বসু চৌধুরী, মহুয়া ঘোষ, সুগতা দে, শমী দে, অংশুমান মুখার্জী, নিতাই বসাক, পার্থদাস, কালী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ্ত সরকার, সৌরভ বসু, পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, প্রীতম মজুমদার, মিনি বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ শঙ্কর রায়, অনির্বাণ রায়, কৌশিক চক্রবর্তী, সোনালী চ্যাটার্জী, রাজর্ষি সেনগুপ্ত, বাণীকুমার মাইতি।

24-পরগনা ঃ অর্ণব বসু, সঞ্জিৎ চ্যাটার্জী, সরোজভূষণ মুখার্জী, দেবযানী দাস, জয়ন্ত মিশ্র, মিঠু ঘোষ, অনাদি বিশ্বাস, সৌমিত্র রায়, শুচিস্মিতা ঘোষ, শ্রীকুমার দে, প্রমিত ঘোষ, কুমারেশ মারিক, সঞ্জয় ঘোষ দস্তিদার, অরিজিৎ ভট্টাচার্য, অঞ্জন সেনগুপ্ত, সঞ্জয় অধিকারী, সুমনা নস্কর, শুভ্রজ্যোতি চক্রবর্তী, পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য, সুখেন্দু বিশ্বাস, মাধাই চন্দ্র ঘোষ, তাপস কুমার দাস, মীরা মৌলিক, স্বাগত মুখার্জী, শুভঙ্কর মজুমদার, মনীশ রায়, কৌশিক রায়, অনিন্দ্য দে।

হাওড়া ঃ দেবব্রত ব্যানার্জী, কৌশিক গুহ, শৌভিক চ্যাটার্জী, গার্গী চক্রবর্তী, কৌশিক কুমার পাল, সুজাতা সাহা, সঞ্চিতা ঘোষ, শান্তনু ভট্টাচার্য, পল্লব ব্যানার্জী, বর্ণালী সামন্ত, অভিজিৎ চক্রবর্তী, অমিত মল্লিক, বিশাখা ভট্টাচার্য, শমিতা কয়াল, অয়ন চৌধুরী।

হুগলী ঃ রজত ঘোষ চৌধুরী, প্রিন্স দাশগুপ্ত, সুধীর ভট্টাচার্য, অরিন্দম গাঙ্গুলী, শান্তনু পাল, সংগীতা ব্যানার্জী, জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী, অসিত দোলুই।

বর্ধমান ঃ অভিজিৎ গোস্বামী, জয়তী বসু. রণজিৎ মজুমদার, কাকলি হালদার, স্নিগ্ধা উপাধ্যায়, বিধান চন্দ্র খান, অরূপ কুমার দত্ত, রুদ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাজ কুমার ব্যানার্জী, বনানী বন্দ্যোপাধ্যায়, অঙ্কন চক্রবর্তী, অনিন্দ্য হালদার, তনিমা মুখার্জী, দীপঙ্কর দে, কৃষ্ণা দে, প্রবুদ্ধ রায়. চন্দ্রা রায়, শম্পা কিস্কু, অভিজিৎ নন্দী, রামপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, মাধব ঘোষ দস্তিদার, মালা ঘোষ, হাসি লাহা, শাশ্বতী দত্ত, সৌগত ব্যানার্জী, স্বাতী সাহা, কুন্দন কোনার, সোমা মুখার্জী মিহির সাঁতরা, কান্তিরঞ্জন মাহাতো, আশিস রায়, সুমন কুমার দাস।

মেদিনীপুর ঃ দুর্লভ ব্যানার্জী, সুবীর দণ্ড, শুভ্র চৌধুরী, সন্দীপন দাস, অসিত রায়, জয়ন্ত দত্ত মজুমদার, শক্তিময় দাঁ, চিন্ময় চক্রবর্ত্তী, অরূপ কুমার সামন্ত, শাশ্বতী পাইক, তপন কুমার পাহাড়ী।

নদীয়া ঃ সুনীল সরকার, মনোজিৎ ইন্দ্র, বিকাশ কোলে, রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, ছন্দোময় মণ্ডল, প্রিয়ব্রত বিশ্বাস, অরবিন্দ বিশ্বাস, তৃপ্তিরাণী বসাক।

মুর্শিদাবাদ ঃ সৌম্য মুখার্জী, প্রণবেশ কুমার চন্দ্র, প্রণবকুমার বিশ্বাস।

বাঁকুড়া ঃ রাজেশ সিংহ, শুদ্ধ কল্যাণ পাল, রূপাঞ্জন সাহা, সব্যসাচী লোহার, দয়াময় মাজী, শুভ্রনীল বিশ্বাস।

পঃ দিনাজপুর ঃ মুকুল ব্যানার্জী, কুন্তলিকা সাহা, অভিজিৎ সাহা, কিশোর কুমার আগরওয়াল।

মালদহ ঃ অরুণায়ন শর্মা, উজ্জ্বল কর্মকার। **কুচবিহার ঃ** রথীন্দ্রনাথ হিসাবিয়া।

জলপাইগুড়ি ঃ সন্ধিৎসু দাস, শুভব্রত দাস। **দার্জিলিঙ্ ঃ** ধ্রুবদাস মহলানবীশ।

আসাম ঃ ধুবরী ঃ মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। **শোনিতপুর ঃ** সঞ্জয় কুমার ভট্টাচার্য্য। **বঙ্গাইগাঁও ঃ** রুবি সূত্রধর।

সেপ্টেম্বর '86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সব কটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিন জন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **অনিন্দ্য দাস ঃ** 22, বারোয়ারীতলা লেন, কলকাতা-700 010।
2. **মহঃ তোজাম্মেল শা ঃ** প্রযত্নে, মুর্শিদন শা, গ্রাম - রামেশ্বর বাটী, পোস্ট—চাকাশি, জেলা—হাওড়া।
3. **সৌম্য ভট্টাচার্য্য ঃ** N/Q-6, ডানলপ কোয়ার্টার্স, সাহাগঞ্জ, হুগলী।

সেপ্টেম্বর '86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সব কটি প্রশ্নের উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ কৌশিক বাগচি, তারকনাথ দাস, দীপ্তিরাণী সামন্ত, মণিদীপা দাঁ, হৈমন্তী চৌধুরী।

24-পরগনা ঃ রুদ্রপ্রসাদ হালদার, মলয় কুমার বৈদ্য, অনুপম দাসমাজী।

হাওড়া ঃ দেবাশিস সেনগুপ্ত, সঞ্জয় দলপতি, বরুণ বিশ্বাস শ্যামল সাধু খাঁ।

হুগলী ঃ অনুপম বসু সরকার, রাজেশ শেঠ, শাঁওলী বিশ্বাস, পিয়ালী সরকার।

বর্ধমান ঃ দেবজ্যোতি পাণি, মোহনলাল চক্রবর্ত্তী, আশিস মণ্ডল, অমিত দাস, মুরারিমোহন রক্ষিত, শ্রাবণী গরাই।

মেদিনীপুর ঃ দিলীপ দাস, চৈতালী কুণ্ডু, অভিজিৎ সরকার, শান্তনু চৌধুরী, অনুপকুমার দাশ, শেখ মসিউর রহমান, শান্তনু দিণ্ডা, রাজেশ গিরি।

নদীয়া ঃ শ্রীদাম সরকার, জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস। **মুর্শিদাবাদ ঃ** আখতারুজ্জামান।

বীরভূম ঃ প্রশান্তকুমার মুখার্জী, সুদীপ্ত সেনগুপ্ত। **পঃ দিনাজপুর ঃ** রঞ্জিত চন্দ।

কুচবিহার ঃ তপন কুমার রায়।

** সেপ্টেম্বর '86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ফোটো কুইজ এবং আই-কিউ-টেস্ট-এর সব কটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারে নি।

অগ্নি সংকেত

বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী

আজকাল বিভিন্ন মহলে অগ্নিসংযোগ এক ব্যাপক ঘটনা। এই তো সেদিন 'নিউ মার্কেটে' এক অগ্নিসংযোগে অনেক ক্ষতি হল। আগে থেকে অগ্নি সংকেত না পেলে, যখন ব্যাপারটা আঁচ করা যায়, ততক্ষণে দুর্ঘটনা অনেক দূর এগিয়ে যায়। এখানে যে মডেলটির কথা আলোচনা করা হল তার সাহায্যে আমরা প্রথম থেকে সতর্ক বার্তা পেয়ে যাব। এই মডেলটি তোমরা খুব সহজে ও কম খরচে তৈরি করতে পারবে। চিত্রানুযায়ী বিভিন্ন অংশ সংযুক্ত কর।

এর জন্য কি কি প্রয়োজন—

এই মডেলটির জন্য প্রধানত যে জিনিসটির প্রয়োজন, সেটি হল থার্মিস্টার। এটা একটা অর্ধপরিবাহী পদার্থ। এর প্রধান ধর্ম হলো তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোধ কমে যাওয়া। যখন থার্মিস্টারকে উত্তপ্ত করা হয়, তখন এর রোধ কমে যাবে, আবার কম্পন শুরু হবে এবং স্পিকারে সংকেত বার্তা শোনা যাবে। সমস্ত বর্তনীটা একটা প্রমাণ মাপের কাঠের বোর্ডের উপর বসানো হল। থার্মিস্টা (T)-কে ঠাণ্ডা রাখার জন্য তাপ শোষক হিসাবে (heat sink) যে কোন ধাতব পাত থার্মিস্টারে আটকে দিতে হবে। পোটেশিওমিটারের সাহায্যে রোধ কমিয়ে শব্দ বাড়িয়ে তোলা যায়।

ট্র্যানজিসটর—(TN)—AC 128…INO
ক্যাপাসিটর C_1—0·1mfd 16 WVdC
C_2—0 22mfd 16 WVdC.
পোটেনসিওমিটার (X)—500KΩS 101 watt
থার্মিস্টার (T)—DLZ 100 অথবা DLY 100
ট্রান্সফরমার—128 থেকে ৮Ω লোডের আউটপুট ম্যাচিং। AC.
স্পিকার (S) —8ΩSPM যে কোনো মাপের।
ব্যাটারি—9 ভোল্ট।

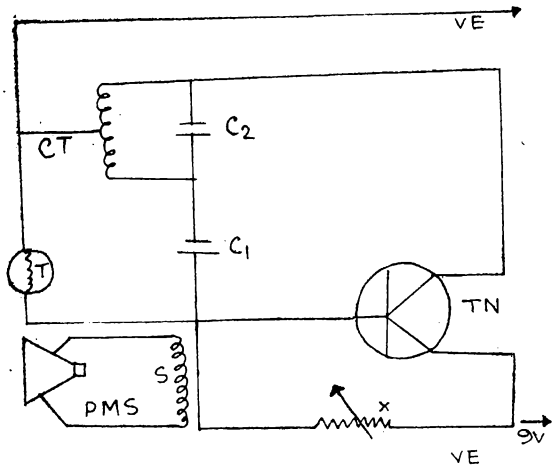

মডেলটি এমন জায়গায় রেখে দাও যেখানে আগুন ধরার সম্ভাবনা রয়েছে। মডেলটি ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য একটা উত্তপ্ত বস্তু থার্মিস্টারের কাছে আনা হল। বর্তনী ঠিক থাকলে স্পিকারে সতর্ক সংকেত বার্তা শোনা যাবে।

C/o. নৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, 7C, বিজয়নগর নৈহাটি, উত্তর 24 পরগনা।

শব্দকূট নীলাদ্রি নাথ

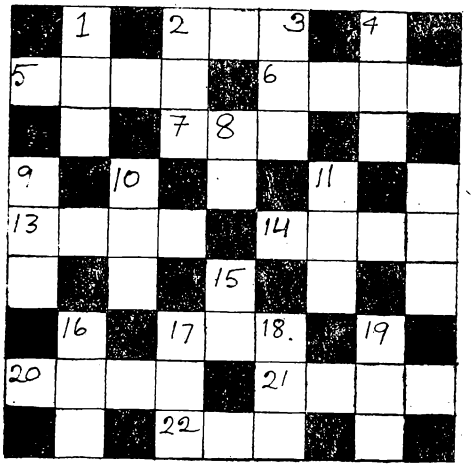

সূত্র ঃ পাশাপাশি ঃ (2) উদ্ভিদের অণুখাদ্য একটি মৌল। (5) প্রশম দ্রবণে যে নির্দেশকের রঙ বেগুনী। (6) তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারক। (7) অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ায় জল ছাড়া যা উৎপন্ন হয় (উল্টো করে)। (13) সবচেয়ে হালকা ধাতু। (14) নিউক্লিয়াসে নিস্তড়িৎ কণা। (17) বসন্তের টীকা আবিষ্কারক। (20) সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী। (21) পাস্তুর যে রোগের সিরাম আবিষ্কার করে বিখ্যাত। (22) দর্শনেন্দ্রিয়।

সূত্র ঃ উপরনিচ ঃ (1) শক্তিবাহী কণা, (2) যে সব কণা 'বসু-সংখ্যায়ন' মেনে চলে। (3) ডিনামাইট আবিষ্কারক। (4) যে সূত্র অনুসারে বায়ু প্রবাহ, সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাঁদিকে বেঁকে যায়। (8) ভর × ত্বরণ (9) প্যারামিসিয়ামের গমন অঙ্গ। (10) পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন করলে যা উৎপন্ন হয়। (11) ভারী-জল আবিষ্কারক। (12) জীবের বংশবৃদ্ধি করার পদ্ধতি। (15) 'Au' যে মৌলের প্রতীক চিহ্ন। (16) তেজস্ক্রিয়তার একক। (17) একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। (18) পাইন গাছের বর্জ্য পদার্থ। (19) পাঞ্জাবের সবচেয়ে দীর্ঘ নদী।

প্রফেসর এন. নাথ, আর. কে. কলেজ, পোঃ কইলাশহর ত্রিপুরা (নর্থ)

আই-কিউ টেস্ট

ডিসেম্বর 1986

1. "একজন অভুক্ত অথবা অসুস্থ ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া উচিৎ।" এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কোনটি সত্য—
   (a) যেহেতু প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরের সন্তান তাই তারা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব ভাই ভাইকে সাহায্য করবে।
   (b) ভিক্ষা দেওয়া আইনগতভাবে নিষিদ্ধ নয়।
   (c) ভিক্ষুকদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ভালোভাবে খাওয়া উচিৎ, যাতে তারা কাজ করতে উৎসাহী হয়।
   (d) একজন ভিক্ষুকেরও সুখী জীবন যাপন করার অধিকার আছে।
2. ঈস্ট একটি (a) ব্যাকটিরিয়া জাতীয় জীবাণু, (b) ভাইরাস জাতীয় জীবাণু, (c) ছত্রাক জাতীয় জীবাণু।
3. নিতাই 1000 টাকা নিয়ে বাজারে গেল। 990 টাকা খরচ করল। মোট টাকার শতকরা কত বাঁচল ?
4. নিচের সংক্ষিপ্ত শব্দগুলি দ্বারা কী বোঝায় ঃ
   (a) I. Q., (b) A. I. R. (c) S. O. S. C , (d) V. (e) B. B. C.
5. কত খ্রীস্টাব্দে প্রথম 'অস্কার' পুরস্কার দেওয়া হয় এবং কারা সেই পুরস্কার পান ?

অদৃশ্য খেলোয়াড় প্রসঙ্গে

এবারের পুজো সংখ্যার 'অদৃশ্য খেলোয়াড়' খেলাটায় একজন খেলোয়াড় কি ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সেটা বোধহয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মিত পড়ুয়াদের বুঝতে অসুবিধা হয় নি। কেননা, অনেকটা এই ধরনেরই একটা অদৃশ্য হয়ে যাবার খেলা এর আগে ছাপা হয়েছিল এই পত্রিকারই 1982-র অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায়। তার নাম ছিল 'রহস্যময় নিরুদ্দেশ'। 'রহস্যময় নিরুদ্দেশ'-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বেরিয়েছিল সে বছরেই ডিসেম্বর সংখ্যায়। 'অদৃশ্য খেলোয়াড়'-এর ব্যাপারেও সেই একই ব্যাখ্যা খাটে। কাজেই একই কথা আবার না বলে শুধু জানিয়ে রাখি, যে-খেলোয়াড়টি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তার হাত, পা, মাথা ইত্যাদি এমনভাবে যোগ হয়ে যাচ্ছে অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে যে এক-নজরে তা ধরা পড়ে না। একজন অদৃশ্য হয়ে যাবার পর বাকি অনেক খেলোয়াড়েরই তাই চেহারার কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটছে।

—সিদ্ধার্থ ঘোষ ও সমীর মণ্ডল

প্রশ্নোত্তর

গত সংখ্যায় আন্ত্রিক রোগের সাবধানতা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। সাবধানতা অবলম্বনের জন্য সাধারণত এক লিটার ফুটন্ত জলকে ঠাণ্ডা করে তাতে এক চামচের মত খাদ্যলবন (3·5 গ্রাম) দশ থেকে বার চামচের মত চিনি বা গ্লুকোজ (20 গ্রামের মত) মিশিয়ে অল্প অল্প করে রোগীকে খেতে দেওয়া উচিত। বাড়িতে যদি খাওয়ার সোডা থাকে তাহলেও সেই জলে মাত্র সিকি চামচের মত মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আর যদি না থাকে তাহলে মাঝে মাঝে অল্প অল্প কচি ডাবের জলও দিতে পারা যায়। কারণ ডাবের জলে পটাসিয়াম লবন থাকে। সাধারণভাবে উদরাময় ও আমাশার যে সব বড়ি পাওয়া যায় তাকে ব্যবহার না করাই ভাল। ওতে অনেক সময় খারাপই হয়। ভাল চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে এবং সুপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে। ওষুধ দোকানে ঐ সব রোগের জন্য একরকম গুঁড়া লবন প্যাকেটের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রাথমিক অবস্থায় ফোটানো জলকে ঠাণ্ডা করে তাতে ঐ লবন গুলে রোগীকে দেওয়া যেতে পারে।

প্রঃ—রয়েল সোসাইটি সম্বন্ধে জানতে চাই। ডঃ মেঘনাদ সাহা কত সালে রয়েল সোসাইটির সদস্য হয়েছিলেন? অংশুমান কর। বেলিয়াতোড় উচ্চ বিদ্যালয়—বাঁকুড়া।

উঃ—লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি দেশে বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞানীদের সম্মান জানানোর জন্য ইংলণ্ডে সেই ধর্মান্ধতার যুগে অলিভার ক্রমওয়েলের শাসনকালে স্থাপিত হয়। কিন্তু ক্রমওয়েলের সময় প্রতিষ্ঠানটি তেমন স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। পরের দিকে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞানী-গুণী ও শাসকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিজ্ঞান চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠে।

প্রথমের দিকে স্যার আইজাক নিউটনও উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে মনে হয়। সে আমলে কেবল ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদেরই সম্মান জানাতে থাকলেও পরের দিকে সোসাইটির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞানের যে কোন শাখায় বিশিষ্ট অবদান দেখলে বিশ্বের যে কোন বিজ্ঞানীকে সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত করলেন তথা এফ. আর. এস. ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত করতে লাগলেন। সেই থেকে বিজ্ঞানীদের কাছে এটি একটি উচ্চসম্মান বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

ভারতের অনেক বিজ্ঞানীই উক্ত সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। প্রথম 1841 সালে বোম্বাইর বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার জাহাঙ্গীর কারসেৎজী উক্ত সম্মান লাভ করেছিলেন। মেঘনাদ সাহা লাভ করেছেন 1927 সালে। আর যাঁরা উক্ত সম্মানের অধিকারী হয়েছেন তাঁরা হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সি. ভি. রমন, শ্রীনিবাস রামানুজন, বীরবল সাহানী, কে এস. কৃষ্ণান, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর, এস. চন্দ্রশেখর (বর্তমানে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ও আমেরিকায় প্রবাসী), প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ডি. এন. ওয়াদিয়া, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শিশির-কুমার মিত্র, টি. আর শেষাদ্রি, অধ্যাপক পঞ্চানন মাহেশ্বরী ও সি. আর. রাও।

প্রঃ—গঙ্গায় পতিত বর্জ্য পদার্থগুলি কি কি কাজে আসতে পারে? দেবনাথ মণ্ডল, ডাঙাপাড়া-কালনা-বর্ধমান।

উঃ—গঙ্গায় যে সব বর্জ্যপদার্থগুলি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তাদের মধ্যে মানুষের পরিত্যক্ত আবর্জনা ও মলমূত্র এবং কলকারখানার দ্বারা পরিত্যক্ত পদার্থসমূহ প্রধান। বিশেষ করে গঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা শহরগুলি থেকেই বর্জ্য-পদার্থের বেশির ভাগ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

শহরের পাকা নর্দমা বাহিত পাঁক ও আবর্জনাকে কাজে লাগাতে হলে কতকগুলি নর্দমার মুখকে একত্রিত করে বিশোধন করার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশোধন করার পর জলকে ঝামা পাথরের স্তরের ভেতর দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে গঙ্গায় আর তলানীকে কৃষক্ষেত্রে সার ও নিচু জায়গা ভরাটের কাজে ব্যবহার করা যাবে। মলমূত্রকে সোজাসুজি নিক্ষেপ না করে বায়ো গ্যাস তৈরি করা যায়। একদিকে পাওয়া যাবে জ্বালানী রূপে গ্যাস ও অপরদিকে লাভ হবে নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার।

কলকারখানা থেকে পরিত্যক্ত গরম জলকে একটা চৌবাচ্চায় সংরক্ষিত করে তাতে বান জাতীয় মাছ চাষ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। অপর পদার্থগুলিকেও বিশোধন করার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। সেখান থেকে বহু রাসায়নিক দ্রব্য, ধাতু ও শিল্পে ব্যবহারযোগ্য বহু জিনিসকে লাভ করা সম্ভব হবে।

প্রঃ—আম কাঁচায় টক কিন্তু পাকলে মিষ্টি হয় কেন? চন্দন দাস, সুভাষ উদ্যান-পানিহাটি, 24পরগনা।

উঃ—প্রশ্নটি মাত্র কয়েক মাস আগে প্রশ্নোত্তর বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। একই প্রশ্ন বার বার আলোচনা করা সম্ভব নয় বলে মনে কিছু করো না। আগের সংখ্যা-গুলি দেখে একটু কষ্ট করে উত্তরটা জেনে নাও।

প্রঃ—সর্দি করে কেন? অরূপ হালদার, মানবাজার—পুরুলিয়া।

উঃ—সর্দি হওয়াকে আমরা অনেক সময় 'ঠাণ্ডা লাগা'

বলি। সাধারণত জলে বেশিক্ষণ ভিজলে, গরমের পর হঠাৎ স্নান করলে, ভিজে-স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে ঘুরে বেড়ালে শরীর পরিবর্তিত পরিবেশটাকে সহসা মানিয়ে নিতে পারে না এবং ঠাণ্ডা পরিবেশে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে একজাতীয় ভাইরাস দেহে সংক্রমিত হওয়ার সুযোগ পায়। আর ঐ ভাইরাসদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াকেই বলে সর্দি লাগা।

প্রঃ—জ্বর হয় কেন? জ্বর হলে খাবারগুলো জিভে বিস্বাদ লাগে কেন? জ্বর হলে গায়ের উষ্ণতা বাড়ে কেন? জ্বরের সময় কপালে জলের পটি দেওয়া হয় কেন?

জানতে চেয়েছো (1) ইছাপুর হাইস্কুল, হুগলী থেকে দোলারানী বসু, মালারানী বসু, মীনাক্ষী বসু, নমিতা সরকার ও শিখারানী সরকার। (2) শ্যামদাস দিয়াড়, মুর্শিদাবাদ থেকে গোলাম মোর্তজা। (3) অবিনাশপুর, সিউড়ি-বীরভূম থেকে চম্পা পাল।

উঃ—জ্বর কোন একটা রোগ নয়। কোন কোন রোগের উপসর্গ রূপে দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে আমরা জ্বর বলে থাকি।

তোমরা সবাই বোধ হয় জানো, সুস্থ দেহে একদিকে যেমন তাপ উৎপন্ন হচ্ছে অপরদিকে তেমনই ব্যয়ও হচ্ছে। বাড়তি তাপ তাই থাকতে পারছে না। কোন কোন রোগের আক্রমণে যখনই দেহের তাপ উদ্বৃত্ত হয় তখনই বলা হয় জ্বর হয়েছে। উক্ত সময়ে অর্থাৎ রোগের প্রকোপে জিভের স্বাদ কোরকগুলি স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ও অন্যান্য আরও কত উপসর্গ প্রকাশ পায় (বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে উপসর্গ ভিন্ন ভিন্ন)।

জ্বরের সময় মাথায় বা কপালে জল বা জলের পটি দিলে জল বাষ্পায়িত থাকে এবং বাষ্পায়নের জন্য যে তাপ দরকার হয় তা সরবরাহ করে মাথা ও কপাল। ফলে দেহ ধীরে ধীরে তাপ হারায় অর্থাৎ জ্বরের প্রকোপ হ্রাস পায়। তবে মনে রাখবে, সারা শরীরটাকে জলে ভেজালে খারাপই হবে। অত্যধিক ঠাণ্ডায় শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সেই সুযোগে অন্যান্য রোগেরও আক্রমণ ঘটবে।

দোলা, মালা, মীনা, নমিতা ও শিখার অপর প্রশ্ন 'বেড়াল প্রভৃতি প্রাণীদের অন্ধকারে চোখ জ্বলে কেন?' এর জন্য পূর্ববর্তী সংখ্যা দেখ।

প্রঃ—কেটে গেলে শরীর থেকে রক্ত নির্গত হয়, তাকে খেয়ে ফেললে কি শরীরে সমান রক্ত উৎপন্ন হবে? চপল-কুমার মণ্ডল। তারা ছাত্রাবাস-বালিয়া, গড়িয়া, কলিকাতা-84।

উঃ—প্রথমে জানাই যে, রক্ত খাদ্য নয় এবং একে খাওয়াও উচিত নয়। (যদিও শরীরের লোহের ঘাটতি পূরণের জন্য প্রাণীর রক্তকে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এক জাতীয় টনিকে রূপান্তরিত করা হয়)।

আমরা যা খাই, সেগুলি পাকস্থলীতে নানারকম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিপাক হয়। তারপর সরল অণুর আকারে ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে ভিলাই, যকৃত, ফুসফুস ও শেষে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে বাহিত হয়। সেখানে হৃৎপিণ্ডের ক্রমাগত সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে সারবস্তু মহাধমনীতে প্রবেশের সুযোগ পায় এবং রক্তের দ্বারা বাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে কোষে কোষে।

অতএব রক্ত খেলে সরাসরি রক্ত তৈরি হতে পারে না।

প্রঃ—সমীরকুমার হালদার, রমাকান্তনগর—জয়নগর—24-পরগনা থেকে সূর্য অপেক্ষা পৃথিবীর ভর বেশি কেন জানতে চেয়েছো।

তোমার ধারণাটি কিন্তু ভুল। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্যের ভর ঢের বেশি। শুধু তুলনামূলকভাবে ঘনত্বটা কম (সূর্য দেহের ঘনত্ব 1·4 এবং পৃথিবীর ঘনত্ব 5·5)। তাই আয়তনে 13 লক্ষ গুণ সূর্য বড় হলেও ওজনে ত্রিশ লক্ষ পৃথিবীর সমান।

সূর্যের ভর যে কোন গ্রহের তুলনায় অনেক-অনেক বেশি। এত বেশি যে, সূর্য ও গ্রহের সম্মিলিত ভরকেন্দ্র সূর্য দেহে তার কেন্দ্র বিন্দুর সন্নিকটে অবস্থিত। সেই কারণে গ্রহদের সূর্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করতে হয় অথচ সূর্য গ্রহদের দ্বারা প্রভাবিত কিনা বোঝা যায় না।

তোমার অপর প্রশ্ন 'পৃথিবী থেকে চন্দ্রের কেমন করে সৃষ্টি হয়েছে?' তোমার এ ধারণাও ভুল। এককালে এমন একটা মত প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে পরিত্যক্ত। বর্তমানে মনে করা হয়, সূর্য থেকেই গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি।

প্রঃ—কোন বিষয়ের উপর বিশেষ জ্ঞানকে যদি বিজ্ঞান বলা হয় তাহলে সাহিত্যের উপর জ্ঞানকে বিজ্ঞান কেন বলব না? অমিতাভ রায়, বিজ্ঞানবিভাগ বিবেকানন্দ কলেজ।

উঃ—প্রশ্নটির উত্তরে বিজ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞাটাই জানাতে হয়। "বিজ্ঞান" শব্দটির অর্থ অবশ্য ব্যাপক এবং এর বুৎপত্তি গত অর্থ বি-জ্ঞা+অনট। অর্থাৎ "বিশেষ" জ্ঞান।

"বিশেষ" শব্দটির আবার নানাজনে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু বিজ্ঞানের ইংরেজী প্রতিশব্দ সায়েন্স এবং এর উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্র প্রধানতঃ পাশ্চাত্য। তাই পাশ্চাত্যের সংজ্ঞাগুলির প্রতি এখানে গুরুত্ব আরোপ করা হল।

প্রথমে উল্লেখ করতে হয় যে, আজ পর্যন্ত সায়েন্স তথা বিজ্ঞানের যত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে তাদের কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রতিটি সংজ্ঞার মধ্যে কিছু না কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে। অথচ গুরুত্ব কারও কম নয়।

আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আগে বিজ্ঞান বলতে পৃথক কোন শাস্ত্র ছিল না। এতবড় যে গ্রীকবিজ্ঞান তাও দর্শনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং গ্রীক বিজ্ঞানীরা মূলতঃ দার্শনিকই ছিলেন। বৈদিক এবং বেদোত্তর যুগের ভারতীয় বিজ্ঞানী, এমনকি একাদশ শতাব্দীর আরবীয় বিজ্ঞানীরাও ছিলেন সেই দার্শনিক। তাই বিজ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামাননি—এটি সম্পূর্ণরূপে আধুনিক কালের ব্যাপার।

মনে হয় বিজ্ঞানের সংজ্ঞা সর্বপ্রথম 'ওয়েবস্টার'ই তাঁর অভিধানে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সংজ্ঞা ছিল Science is the knowledge of principles or fact' অর্থাৎ বিজ্ঞান হচ্ছে তত্ত্ব কিংবা তথ্য সম্বন্ধে জ্ঞান। উক্ত সংজ্ঞায় তিনি বিজ্ঞানের বুৎপত্তিগত অর্থ তথা ব্যাপক অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সংজ্ঞাটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলে বিজ্ঞানের সঙ্গে যাদের ঘোরতর বিরোধ সেই ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি সবকিছুই বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞান বলতে বর্তমানে যা বোঝায় তার অর্থ এত ব্যাপক নয়। একেবারে সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ।

বিজ্ঞানের অর্থকে প্রথম সীমাবদ্ধ করে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। তাতে বলা হয় 'প্রাকৃতিক ঘটনাবলী এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ-জ্ঞানই বিজ্ঞান।' কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা। তাঁরা বললেন, আধুনিক বিজ্ঞান হচ্ছে সম্পূর্ণ পরীক্ষানির্ভর। কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অথবা প্রাকৃতিক কোন ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে গেলে হাতেনাতে পরীক্ষা করতে হয়। কিন্তু এমন কোন নির্দেশ উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে লাভ করা যায় না। ফলে ইওরোপে রেনাসাঁ আমলের প্রখ্যাত মনীষী রোজার বেকন গ্রীক হিপোক্রাতেশের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উল্লেখ করেন 'বাস্তব পরীক্ষা থেকে লব্ধ সিদ্ধান্তই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠার মূলনীতি।' হিপোক্রাতেশ প্রথম কেবলমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্রকে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বেকনের ঐ নীতিকে সেদিন গ্যালিলিও, উইলিয়ম হার্ভে, ভেসালিয়াস প্রভৃতি অনেকে অনুসরণ করেছিলেন এবং প্রকৃত বিজ্ঞানী আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা তার পূর্বের সংজ্ঞা এবং বেকনের সংজ্ঞার সমন্বয়ের মাধ্যমে এক নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করে 'Science is the knowledge ascertained by observation and experiment, critically tested, systematised and brought under general principles'।

পরের দিকে উক্ত সংজ্ঞাটির মধ্যেও ত্রুটি লক্ষ্য করেন অনেকে। তাঁরা ব্যক্ত করলেন, উপরোক্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান তথা বিজ্ঞানের যেন কোন সীমা নেই। একটি তত্ত্বকে প্রমাণ করতে গেলে অপর অনেক তত্ত্বের প্রয়োজন হয় এবং নতুন নতুন তত্ত্বের অবতারণা করতে হয়। অপরদিকে নতুন তত্ত্বকেও যাচাই করতে হয় পরীক্ষা ও প্রমাণের ভিত্তিতে। তাই এর অসম্পূর্ণতা ঢাকতে 'ক্রাউফার' নতুন এক সংজ্ঞার অবতারণা করেন। বিজ্ঞান কেবল 'বিশেষ জ্ঞান' নয় এটি এক ধরনের তৎপরতা এবং এই তৎপরতার সাহায্যে মানুষ তার-চতুষ্পার্শ্ববর্তী সব কিছুর উপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারে।

ক্রাউফারের সংজ্ঞাটিই সর্বাধুনিক এবং এর প্রশংসা করে থাকেন অনেকেই। তাঁদের মতে উক্ত জ্ঞানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশকে জয় করার স্পৃহা। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা আদি মানবের কথা উল্লেখ করেছেন। সেকালে তাদের ধর্মচিন্তা, দর্শনচিন্তা, সাহিত্যচিন্তা প্রভৃতি কোন কিছুরই স্থান ছিল না। ছিল না কোন নিরাপত্তাও। পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে বুদ্ধিবলে সে পাথর ধরতে শিখেছিল, আকাশের বাজ এবং প্রস্তর ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে দেখে আগুন জ্বালিয়েছিল, পশুদের অবলীলাক্রমে তুষারপাতের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখে গায়ে পশুচর্ম জড়িয়েছিল। অথচ অপর কোন জীব তা পারেনি। তাছাড়া এটি যে এক তৎপরতা তার প্রমাণ, মানুষ প্রথম প্রথম আগুনের সাহায্যে বন্যপশুদের তাড়াতো এবং গুহাকে গরম করতো। পরে ঐ আগুনের দ্বারা তারা রান্না করেছিল, মৃৎপাত্রকে পুড়িয়েছিল, কাঁচা ইটকে পুড়িয়ে নগরসভ্যতার পত্তন করেছিল, অবশেষে পাথরের ভেতরে বন্দিনী ধাতুকে মুক্ত করিয়েছিল।

অতএব বিজ্ঞান বলতে আজকে যা বোঝায় তা প্রকৃতপক্ষে পরিবেশকে জয় করার এক তৎপরতা এবং এই তৎপরতা যে কোন আবিষ্কারের মূল ভিত্তি। অপরদিকে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোন কিছুকে আয়ত্ত করার রীতি মানুষ যেন জন্মলগ্নেই লাভ করেছিল। অতএব আজকের 'বিজ্ঞান' বিশেষ জ্ঞান হলেও এর অর্থ আদৌ ব্যাপক নয়। একেবারে সঙ্কুচিত অর্থে প্রয়োগ করায় সাহিত্য প্রভৃতি কোন চিন্তা এর পর্যায়ে পড়ে না।

সুধাংশু পাত্র

ফ্যান্টাসী ও মজার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স** ১৫
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **চারমূর্তি** ১০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **রামধনু** ১০
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
গুপীগাইন বাঘাবাইন ৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদার জুড়ি নেই** ১০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **কম্বল নিরুদ্দেশ** ৮
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের মজার গল্প ১০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা** ১০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **ঝাউবাংলোর রহস্য** ৭
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ১০

ঘনাদা কাহিনীর নতুন চমক !

মৌলিক কাহিনী সার বিপণন সংস্থা ঘনাদাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে— গল্পের প্লট সাপ্লাই করবে ঘনাদা কিভাবে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবেন ?

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদা ও মৌকাসাবিস ১৫

জীবনচরিতমালা

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি
প্রণীত জীবন চরিতমালা
প্রতি খণ্ড দশ টাকা

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ॥ পরমাণু বিজ্ঞানী ভাবা
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ॥ কৃতী বিজ্ঞানী
মেঘনাদ ॥ বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র
কৃতী বিজ্ঞানী সি· ভি· রমন
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ
পরমাপ্রকৃতি সারদামনি
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
আলোকময়ী শ্রীম

বুদ্ধি ও মেধা চর্চার জন্য

অমরনাথ রায় ॥ **নলেজ ক্যুইজ** ১০
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **গণিত ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **সায়েন্স ক্যুইজ** ১০
অলক চক্রবর্তী ॥ **ফিজিক্স ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **কেমিস্ট্রী ক্যুইজ** ১০

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার ॥ কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ লুপ্তধন ৮
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ মেঘনাদ ১০
অদ্রীশ বর্ধন ॥ কিশোর সায়েন্স ফিকশন ১৫
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য ৮

কারিগরী বিদ্যার প্রথম পাঠ
সহজ সরল ব্যাখ্যাসহ প্রায় অর্দ্ধশত মডেলের সচিত্র নির্মাণ প্রণালী
জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত
নিজে নিজে কর ১০

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ **বিচিত্র বিজ্ঞান** ৮
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **যুক্তিতর্ক হেঁয়ালি** ৮
বিমান বসু ॥ **গ্রহ পরিচয়** ১২
পার্থসারথি চক্রবর্তী
মাটি থেকে আকাশে ১০
অমরনাথ রায় ॥ **সংখ্যা নিয়ে খেলা** ৮
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানেরআকস্মিকআবিষ্কার ৮
অমরনাথ রায়
জ্ঞানবিজ্ঞানের মজার খেলা ১০
সাধন দাসগুপ্ত ॥ **আলো আরও আলো** ১৫
সাধন দাসগুপ্ত ॥ **রোমাঞ্চকর রসায়ণ** ১২
সাধন দাসগুপ্ত ॥ **ভাষা গণিত** ২০
সিদ্ধার্থ ঘোষ
অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ১৫
স্যাম লয়েড ও লুইস ক্যারোলের ধাঁধা ১০

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 6th Yr Vol – 8 DECEM 1986/Regd.No.WBEC/255

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে!

জুনিয়র সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

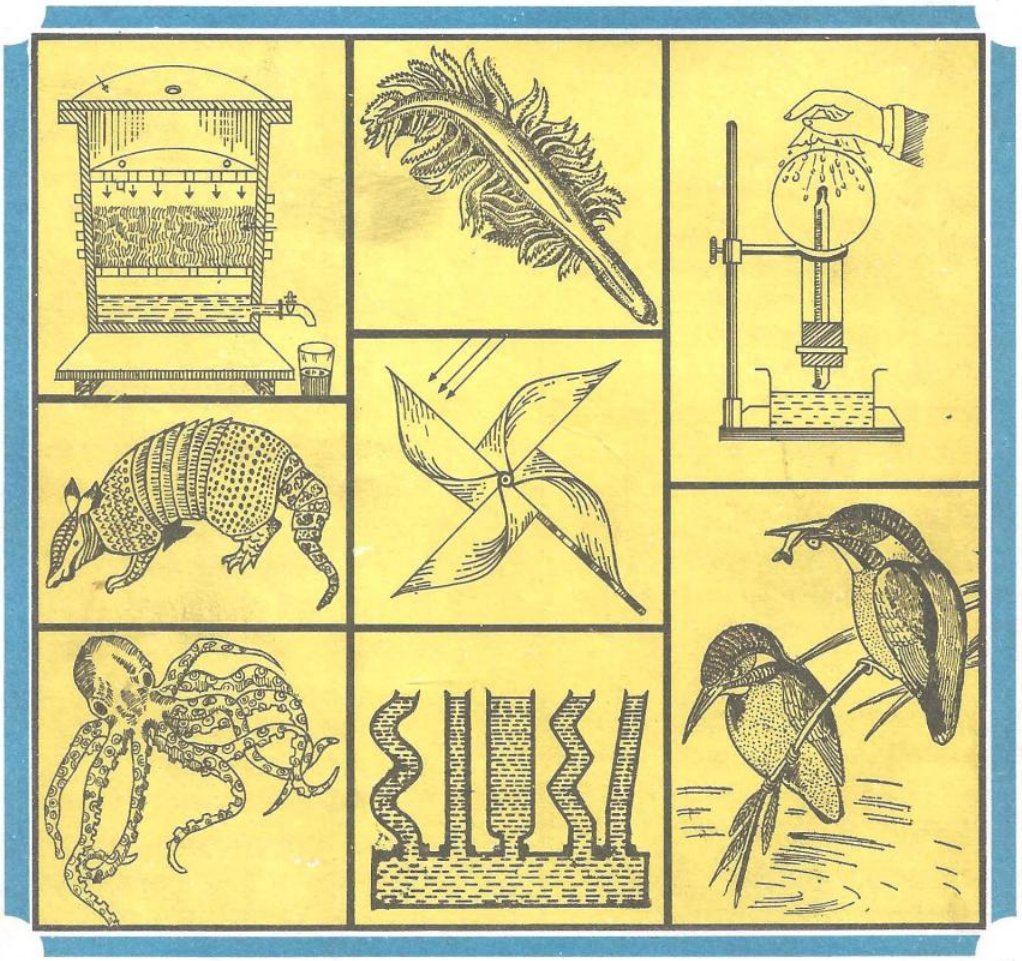

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৪৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৪A, দীনবন্ধু লেন. কলকাতা-6, নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাঃ লিঃ কলকাতা-12।

4·00 টাকা।